বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

25

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

পঞ্চবিংশতি খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'অস্পৃশ্যতা দাসত্বের চেয়েও অনেক বেশি নির্মম। কেননা জীবিকা আইনের কোনও উপায় না থাকলেও তাদের জীবন নির্বাহের দায়িত্ব তাদের-ই গ্রহণ করতে হয়। অন্য একটি কারণে অস্পৃশ্যতা দাসত্বের চেয়েও খারাপ। ক্রীতদাসদের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হত। এর ফলে মুক্ত নাগরিকের চেয়ে তাদের সুবিধা বেশি ছিল। তাদের এই অবস্থার জন্যই মালিক তার নিজের স্বার্থেই তাদের স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বেঁচে থাকার ব্যাপারে দৃষ্টি দিতেন। রোমে ক্রীতদাসদের কখনই জলা কিংবা ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় নিযুক্ত করা হত না। এই সমস্ত এলাকায় শুধুমাত্র মুক্ত নাগরিকদের পাঠানো হতো।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর
'দাসত্ব না অস্পৃশ্যতা' থেকে

AMBEDKAR RACHANA - SAMBHAR
(Collected works of Dr. Ambedkar in Bengali)
Volume - 25
Total No. of Pages : 112

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০০
First Published : December, 2000

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি

Published by
Dr. Ambedkar Foundation.
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.
New Delhi.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ২৫ টাকা (Rs. 25/-)
শোভন সংস্করণ : ৮৫ টাকা (Rs. 85/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
মাননীয়া সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

আশা দাস, আই. এ. এস
সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার

ডি. কে বিশ্বাস, আই. এ. এস
অতিরিক্ত সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার

শ্রী এস কে পাণ্ডা
যুগ্ম সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার
সদস্য সচিব, ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

শ্রীমতী কৃষ্ণা ঝালা, আই. এ. এস
সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী
কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ড. ইউ. এন. বিশ্বাস, আই. পি. এস
যুগ্ম নিদেশক (পূর্ব) এবং স্পেশাল আই. জি. পি
কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ভারত সরকার

ড. এম. পি. জনসন
নিদেশক, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার ঃ পঞ্চবিংশতি খণ্ড

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
মহুয়া ভট্টাচার্য
ড. সন্দীপ দাঁ

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

ভারতের অসম সমাজ-ব্যবস্থা, পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সব কিছুই বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি যে-সব সমস্যাকে দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেছেন, সেই সব সমস্যার মূল কারণ পর্যালোচনা করে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির যেমন তিনি প্রয়াস করেছেন, তেমনি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন একটি আন্তর্জাতিক রূপ। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাও পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়।

আশা করি, এর বাংলা ভাষান্তর বাঙালি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

মেনকা গাঁধী

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
ডিসেম্বর, ২০০০

সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে।

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয়, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং (৭) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক (২৬, আলিপুর রোড, দিল্লি)।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের উক্ত মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় পঞ্চবিংশতি খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরো যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ডি. কে. বিশ্বাস
সদস্য সচিব
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

ডিসেম্বর, ২০০০
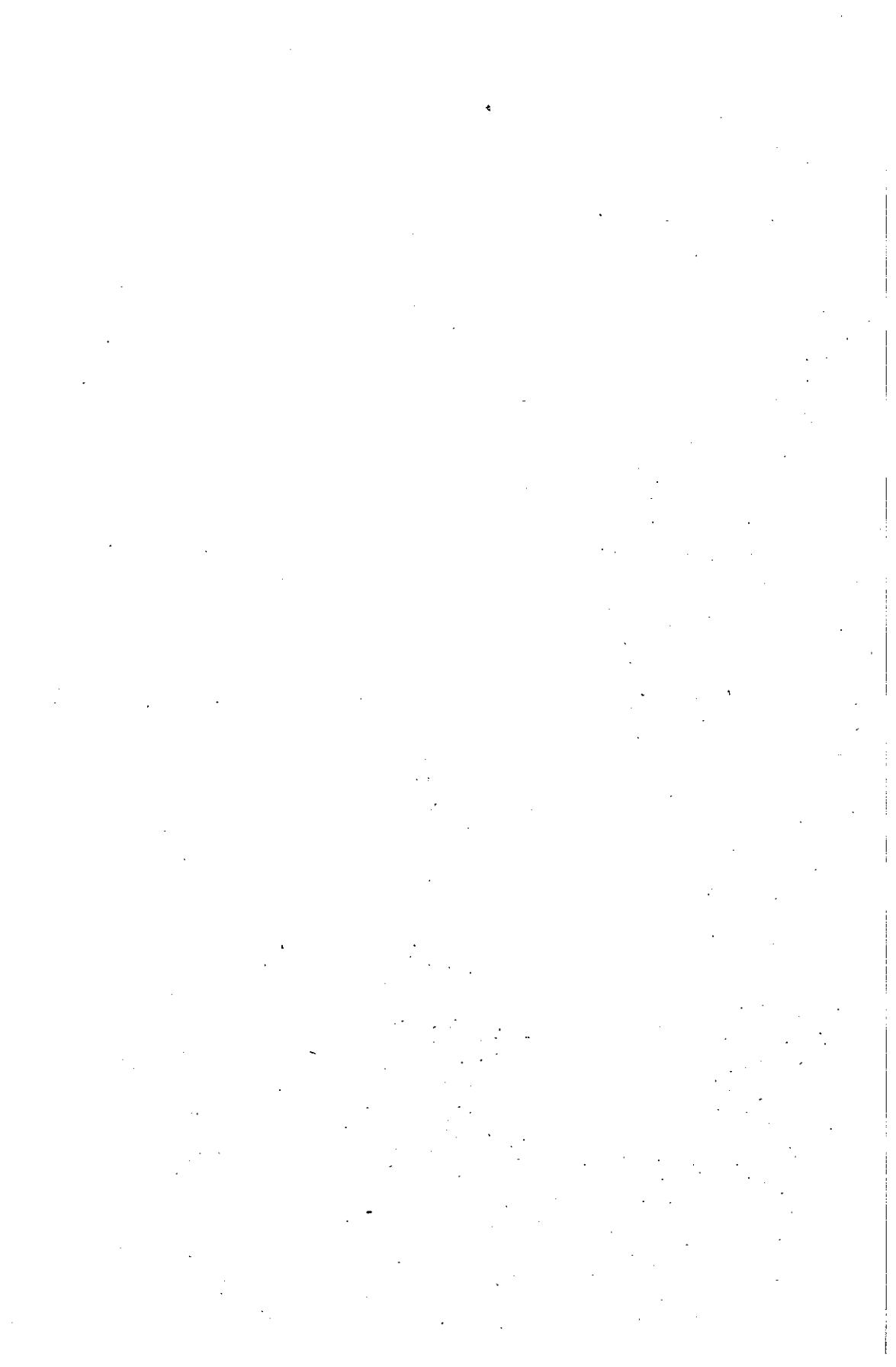
সম্পাদকের নিবেদন

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে এক বিরল ব্যক্তিত্ব। দলিত শ্রেণীর সার্বিক মুক্তির জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর প্রতিটি রচনাতেই এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু তাঁর অনেক রচনাই বহুদিন অপ্রকাশিত ছিল। এই খণ্ডে এ-রকম অপ্রকাশিত অসামান্য কিছু রচনা সংকলিত হয়েছে। 'ভিসার প্রতীক্ষায়' রচনাটি অনেকটা আত্মকথনের মতো। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 'পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি' তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিল। পরে মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ইংরেজিতে প্রকাশিত 'আম্বেদকর রচনা-সম্ভারে'র দ্বাদশ খণ্ডে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যান্য রচনাগুলি অপ্রকাশিত ছিল। সেগুলিও প্রথম দ্বাদশ খণ্ডে স্থান পায়।

এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর প্রকাশিত রচনার পরিপূরক। বিভিন্ন সময়ে কোনও বিষয়ে বক্তৃতা বা রচনার জন্য তিনি যে প্রাথমিক খসড়া করতেন, তার অংশ। কিন্তু আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে এগুলির অবদান অস্বীকার করা যায় না।

এই খণ্ডটি প্রকাশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের কাছে। অনুবাদক ও অনুমোদকদের কাছেও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডেও যতদূর সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠক যদি এর থেকে উপকৃত হয়, তাহলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০০

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র

ভিসার প্রতীক্ষায়
এবং
অন্যান্য অপ্রকাশিত রচনা

অংশ ১
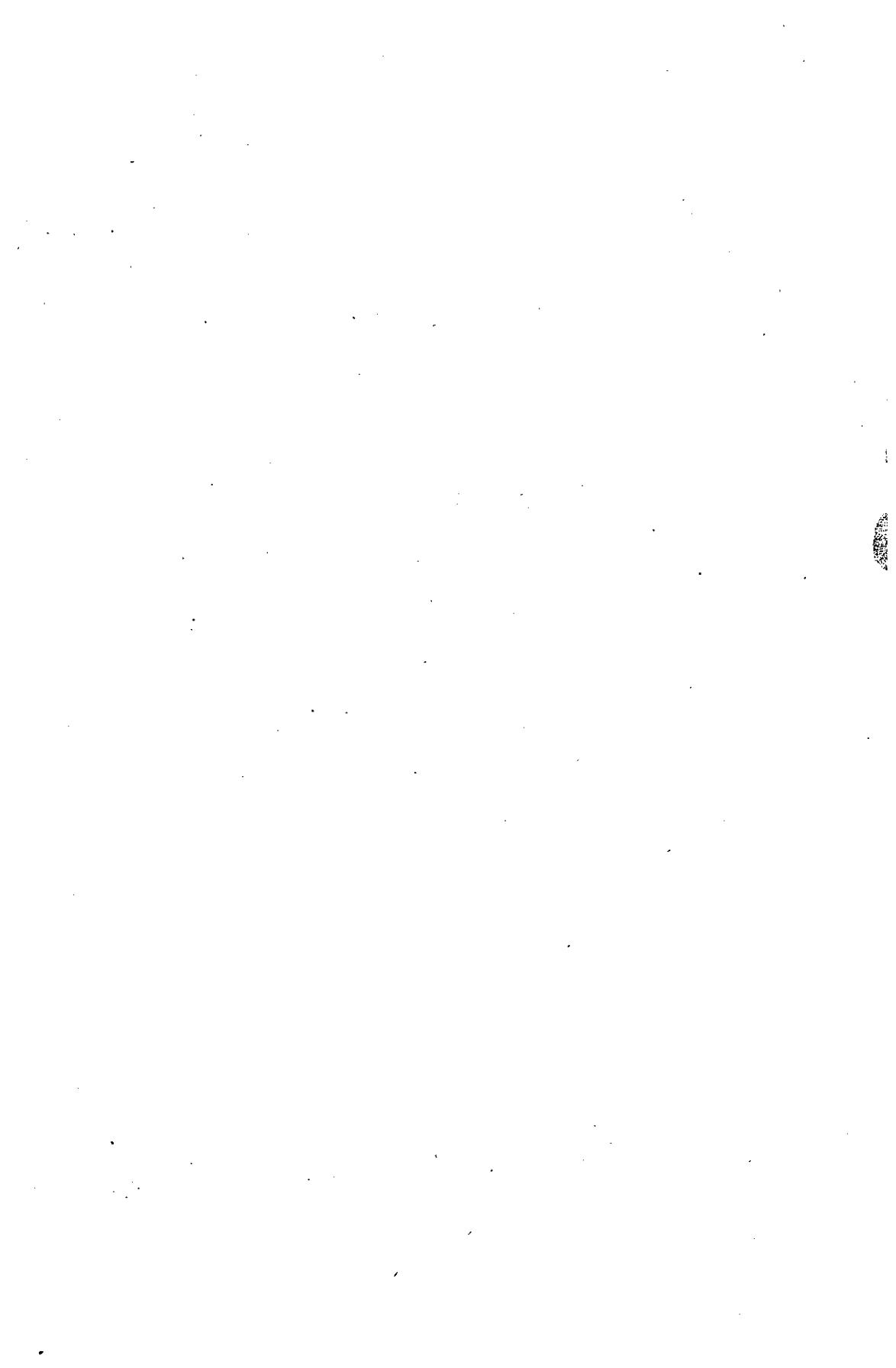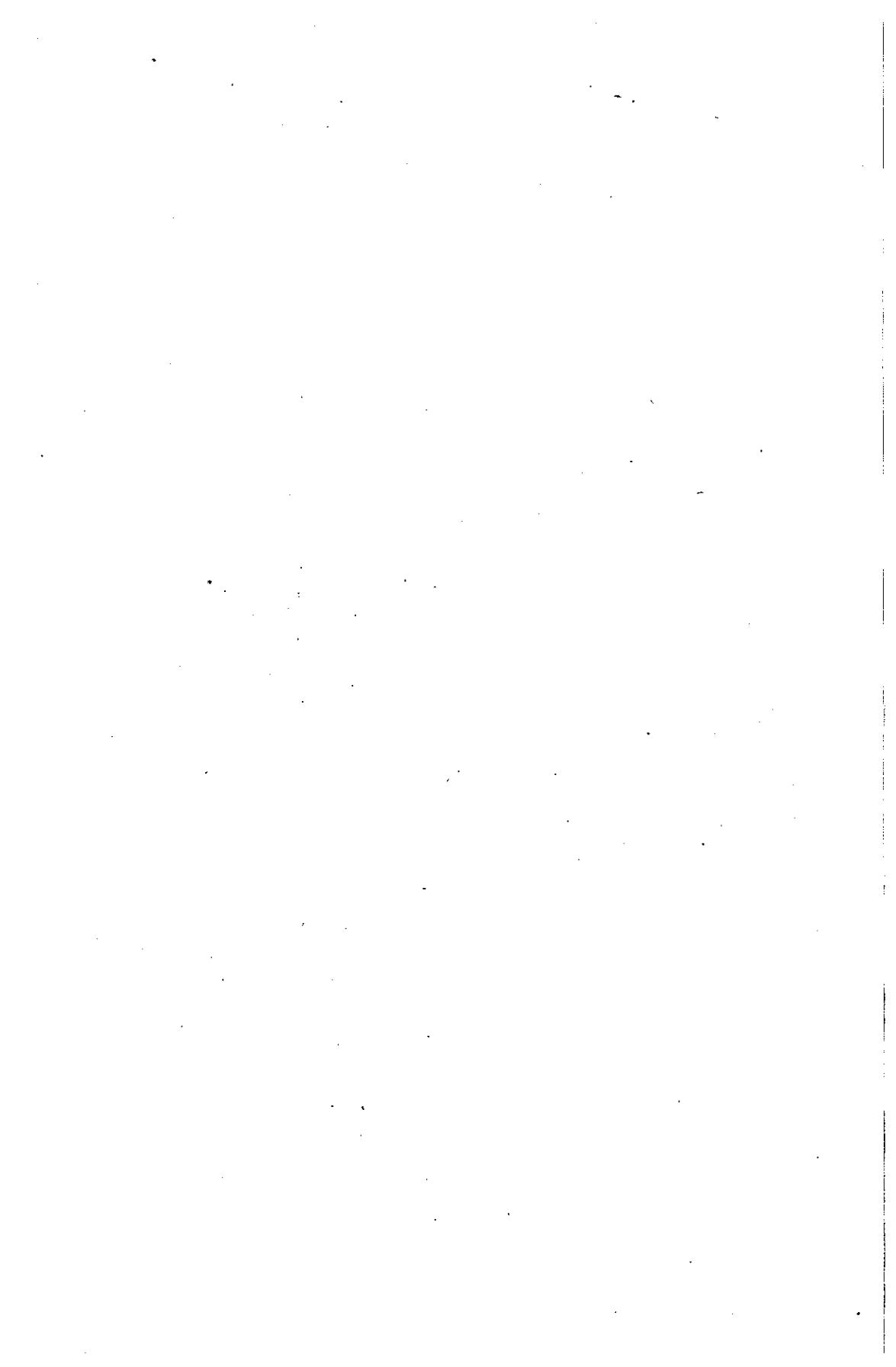
ভিসার প্রতীক্ষায়

ড. আম্বেকরের নিজের হাতের লেখার কিছু স্মৃতিচারণ এখানে সন্নিবিষ্ট করা হল। পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটির সংগ্রহে যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে সেগুলি ১৯৯০-এর ১৯শে মার্চ সোসাইটি প্রকাশ করে।

ভিসার প্রতীক্ষায়

বিদেশীরা অস্পৃশ্যতার কথা জানেন। কিন্তু যেহেতু তারা প্রতিবেশী নয়, তাই আসলে এটা কতটা অত্যাচারমূলক তার সম্যক পরিচয় সম্পর্কে তারা অবহিত নন। কিছু অস্পৃশ্য হিন্দুদের গ্রামের এক প্রান্তে বাস করে, কাউকে না ছুঁয়ে কিংবা গ্রামের কোনও কিছুকে না স্পর্শ করে গ্রামকে নোংরা মুক্ত করা, টুকিটাকি খবরাখবর বয়ে নিয়ে যাওয়া, হিন্দুদের দোর থেকে খাবার সংগ্রহ করা, দূর থেকে হিন্দু বেনিয়াদের দোকান থেকে তেল এবং মশলা সংগ্রহ করা, গ্রামকে নিজেদের বাড়ি মনে করে কাজ করে যাওয়া যে কি করে সম্ভব এটা তাদের পক্ষে বুঝা খুবই মুস্কিল। হিন্দু সমাজ এই অস্পৃশ্যদের সঙ্গে কি ধরণের ব্যবহার করত তার ব্যাখ্যা করা খুবই মুস্কিল। সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে অথবা কয়েকটা ঘটনা তুলে ধরে কিছুটা বলা সম্ভব। আমি অনুভব করেছি, কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরলেই বেশি সুফল পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে আমি নিজের অভিজ্ঞতা এবং পরের অভিজ্ঞতার কিছু নমুনা তুলে ধরেছি। নিজের জীবনের কিছু ঘটনা দিয়ে শুরু করছি।

এক

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রত্নগিরি জেলার দাপোলি তালুক থেকে আমাদের পরিবারের উৎপত্তি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের শুরু থেকেই আমাদের পিতৃপুরুষেরা কোম্পানির সামরিক সেবায় যোগ দেবার জন্য বংশানুক্রমিক পেশাকে ত্যাগ করেছিলেন। আমার পিতাও সেইভাবে সামরিক সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি ক্রমে অফিসার পদে উন্নীত হন এবং যখন অবসর নেন তখন তিনি সুবেদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। অবসরের পরে আমার পিতা দাপোলিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পরিবারকে সেখানে নিয়ে যান। কিন্তু কতগুলি কারণে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। পরিবারকে নিয়ে তিনি সাতারাতে গেলেন। সেখানে তিনি ১৯০১ সালের প্রথম ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। তখন আমরা সাওরাতেই থাকতাম। আমার মা তখন মারা গেছেন। আমার বাবা সাতারা জেলার খাতব তালুকের কোরাগাঁও নামক একটি স্থানে হিসাবরক্ষক হিসাবে কাজ করেছিলেন। সেখানে বোম্বাই সরকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য কূপ খননের কাজ শুরু করেছিলেন। কেননা দুর্ভিক্ষে বহু লোক তখন মারা যাচ্ছিল। আমার বাবা আমাকে, আমার ওপরের বড় ভাইকে, আমার মৃত বড় বোনের দুই ছেলেকে আমার কাকিমা এবং কয়েকজন দয়ালু প্রতিবেশীর অভিভাবকত্বে ছেড়ে দিয়ে কোরেগাঁও ফিরে গেলেন। কাকিমা খুব-ই দয়াশীলা ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের খুব একটা সাহায্য করতে পারতেন না। তিনি খানিকটা খর্বাকৃতি বামুন ছিলেন, তাছাড়া তাঁর পায়ের কিছু সমস্যা ছিল। তিনি কারও সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারতেন না। প্রায়-ই তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হত। আমার বোনদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। কাকিমা যেহেতু কিছু করতে পারতেন না, সেইজন্য রান্না করাটা আমাদের পক্ষে খুব-ই সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আমরা চারটে শিশু স্কুলে যেতাম, আবার আমরা নিজেরাই নিজেদের খাবার প্রস্তুত করতাম। কিন্তু রুটি বানাতে পারতাম না। সেইজন্য চালের সঙ্গে মাংস মিশিয়ে আমরা পুলভ রাঁধতাম। খাদ্য তৈরির সেটিই সহজতম পদ্ধতি ছিল।

আমার বাবা যেহেতু হিসাবরক্ষক ছিলেন, সেইজন্য তিনি নিজের কর্মস্থল ছেড়ে সাতারাতে আমাদের দেখতে আসতে পারতেন না। আমাদের লিখলেন আমরা যেন কোরেগাঁওতে গরমের ছুটি তাঁর সঙ্গে গিয়ে কাটাই। আমরা এই প্রস্তাবে খুব-ই আনন্দ পেলাম, কেননা আমাদের কেউ-ই তখনও রেলগাড়ি দেখি নি।

বিরাট প্রস্তুতি চলল। ইংরেজদের ছাঁটে তৈরি নতুন শার্ট, উজ্জ্বল বিজে টুপি, নতুন জুতো, শিল্ক পাড়ের ধূতি, সবকিছুর অর্ডার দেওয়া হল। বাবা যাত্রাপথের সবকিছু বিশদভাবে জানিয়েছিলেন এবং আমরা কবে রওনা হবো তাও জানাতে বলেছিলেন। কেননা তাহলে গোরেগাঁও স্টেশনে আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য পিওন পাঠাতে পারবেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি, আমার ভাই এবং আমার এক বোনের ছেলেরা রওনা হলাম। কাকিমাকে প্রতিবেশীদের কাছে রেখে গেলাম। তাঁরা কাকিমাকে দেখাশোনার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের জায়গা থেকে রেলস্টেশন ১০ মাইল দূরে ছিল। একটি ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা আমাদেরকে স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমরা নতুন জামা পড়ে এমনভাবে সেজেছিলাম, যেন কোনও অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু কাকিমাকে আমাদের ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন।

আমরা যখন স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন আমার ভাই টিকিট কাটলেন এবং আমাকে ও বোনের ছেলেদের নিজের ইচ্ছে মতো খরচ করার জন্য হাত খরচ দিলেন এক আনা করে। আমরাও হৈ-হৈ করে লেমোনেড বোতলের অর্ডার দিলাম। ট্রেনের বাঁশি বাজলে আমরা লাফিয়ে উঠলাম, পাছে যদি আমাদের ফেলে চলে যায়। আমাদেরকে গোরেগাঁওয়ের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্টেশন মাসুরে নেমে যেতে বলা হয়েছিল।

প্রায় সন্ধ্যে ৫টার সময় ট্রেন মাসুরে এসে পৌঁছালো। আমরা জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যে সব যাত্রীরা ট্রেন থেকে নামল, তারাও নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করল। বাবা কিংবা তাঁর প্রেরিত কাজের লোকটির অপেক্ষায় আমরা স্টেশনে থেকে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করার পরেও কেউ এল না। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। স্টেশন মাস্টার এলেন সব জানতে। তিনি প্রথমে আমাদের টিকিট আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা টিকিট দেখালাম। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমরা এখানে সময় নষ্ট করছি। আমরা তাকে বললাম, আমরা গোরেগাঁও যাব। আমরা বাবা কিংবা তাঁর প্রেরিত ব্যাক্তির জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু কেউ-ই এখনও এসে পৌঁছায়নি। কি করে গোরেগাঁওতে পৌঁছনো যাবে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা প্রত্যেকেই ভাল পোশাক পড়েছিলাম। আমাদের পোশাক কিংবা কথাবার্তা থেকে কারও বুঝা সম্ভব ছিল না যে, আমরা অস্পৃশ্য জাতের ছেলে। স্টেশন মাস্টার নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান। সুতরাং আমাদের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত

ব্যথিত হলেন। স্টেশন মাস্টার জানতে চাইলেন আমরা কারা। আমি এতটুকু চিন্তা না করে বলে দিলাম, আমরা মাহার। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মাহারদের অস্পৃশ্য শ্রেণী বলেই গণ্য করা হত। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমরা দেখতে পেলাম, তাঁর মধ্যে এক ধিক্কার ফুটে উঠছে। তিনি যেই আমার কথা শুনলেন, অমনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেকানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেল। সূর্য প্রায় অস্ত যাচ্ছে। বাবাও আসেন নি, তাঁর প্রেরিত ব্যক্তিও আসেনি। স্টেশন মাস্টার আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যাত্রার শুরুতে যে আনন্দ, যে সুখ পেয়েছিলাম, এখানে তা দুঃখে রূপান্তরিত হল।

আধঘন্টা পরে স্টেশন মাস্টার আবার ফিরে এসে আমাদের কাছে জানতে চাইলেন, আমরা কি করব স্থির করেছি। আমরা বললাম, যদি ভাড়ায় একটা গরুর গাড়ি পাই, আমরা গোরেগাঁও পৌঁছে যাব। যদি এটা খুব দূর না হয় আমরা সোজা চলে যেতে পারব। অনেক গরুর গাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমি যখন স্টেশন মাস্টারকে বলেছিলাম যে, আমরা মাহার সেই কথা গরুর গাড়ির চালকেরা শুনতে পেয়েছিল। তারা নীচুশ্রেণীর পথচারীকে টেনে নিয়ে গিয়ে মহাপাতক হাত রাজি নয়। আমরা দ্বিগুন ভাড়া দিতে রাজি হলাম, কিন্তু বুঝলাম এতে কাজ হবে না। স্টেশন মাস্টারও বুঝতে পারছিলেন না কি করা উচিত। হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে আসল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি গোরুর গাড়ি চালাতে পার?' আমরা যেন সমস্যা সমাধানের একটা সূত্র খুঁজে গেলাম, চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হ্যাঁ, আমরা পারি।' এই উত্তরে তিনি তাদেরকে বোঝালেন যে, আমরা দ্বিগুন ভাড়া দেব এবং গাড়ি নিজেরাই চালাব। গরুর গাড়ির চালক আমাদের সঙ্গে পাশে পাশে হেঁটে যাবে। একজন চালক এতে সম্মত হল, এমন ভাব করল যেন এতে তার ভাড়াও পাওয়া হল অথচ পাপের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হল।

প্রায় ৩টার সময় আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু অন্ধকার হবার আগেই আমরা গোরেগাঁও পৌঁছতে পারব, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হয়ে আমরা স্টেশন ছাড়তে চাইলাম না। আমরা সেইজন্য গবুর গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করলাম, গোরেগাঁও পৌঁছতে কত সময় লাগবে? সে আমাদের আশ্বস্ত করল, তিন ঘণ্টার বেশি নয়। তার কথা বিশ্বাস করে আমরা গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র উঠিয়ে দিলাম। এরপর স্টেশন মাস্টারকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

আমাদের একজন বলগা ধরল। গাড়ি চলতে শুরু করল। লোকটি পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করল।

স্টেশনের কাছাকাছি একটা নদী ছিল। অল্প একটু জল ছাড়া নদীর সবটুকু জল-ই শুকিয়ে গিয়েছিল। গাড়ির চালক এবারে আমাদের প্রস্তাব দিল, আমরা যেন এখানে নেমে কিছু খাবার খেয়ে নিই। কেননা পথে জল না-ও পাওয়া যেতে পারে। আমরা রাজি হলাম। সে তার ভাড়ার কিছুটা অংশ খাবার কেনবার জন্য চাইল। আমার ভাই তাকে কিছু টাকা দিয়ে দিল, সেও প্রতিশ্রুতি দিল তাড়াতাড়ি আসবে। আমাদের ভীষণ ক্ষিধে পেয়ে গিয়েছিল। আমরাও একটু খাবার সুযোগ পাব ভেবে আনন্দিত হলাম। কাকিমা প্রতিবেশীদের বলে আমাদের জন্য খুব সুন্দর খাবার বানিয়ে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা টিফিন বাক্স খুলে খাবার খেতে শুরু করলাম। জিনিসগুলো ধোয়ার জন্য জলের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। আমাদের একজন কাছাকাছি নদীতে জল আনতে গেল। কিন্তু সেখানে এতটুকু জল নেই। কাদা এবং গরু ও মোষের পেচ্ছাপ ও পায়খানায় ভর্তি। বস্তুত, ঐ জল মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। যাই হোক জলের ঐ দুর্গন্ধে আমরা সেই জল পান করতে পারলাম না। ফলে ক্ষিধে মেটার আগেই খাওয়া বন্ধ করে দিতে হল। আমরা গরুর গাড়ি চালকের অপেক্ষায় বসে রইলাম। বহুক্ষণ সে এল না। আমরা তার প্রতীক্ষায় চারপাশে দেখতে লাগলাম। অবশেষে সে এল, আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। চার পাঁচ মাইল আমরা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলাম, সেই চালক হেঁটে চলল। হঠাৎ সে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে বসল এবং আমাদের হাত থেকে বলগাটা নিয়ে নিল। আমরা ব্যক্তিটির এই ধরনের আচরণে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। এই ব্যক্তি পাপের ভয়ে আমাদের ভাড়া দিতে চাইছিল না। এখন সে ধর্মীয় সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে আমাদের পাশে বসল এবং এক-ই গাড়িতে আমাদের সঙ্গে চলল। কিন্তু আমরা ভয়ে কোনরকম প্রশ্ন করতে পারলাম না। আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থল কোরেগাঁওতে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। কিছু সময়ের জন্য গাড়িটা কিভাবে চলে দেখবার ব্যাপারে আগ্রহ ছিল। রাস্তায় কোনরকম আলো ছিল না। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই, এমন কি গরু, ছাগলও নেই যাতে আমরা মনে একটু ভরসা পেতে পারি। এই নির্জনতা দেখে আমাদের ভীষণ ভয় করতে লাগল। ক্রমে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। সব রকম সাহস সঞ্চয় করতে লাগলাম। আমরা মানুষ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। তিন ঘন্টারও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু কোরেগাঁও-এর কোন লক্ষণ

দেখতে পেলাম না। আমাদের মনে এক অদ্ভুত ভাবনা বাসা বাঁধতে লাগল। আমাদের মনে ক্রমে এই সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগল যে, এই ব্যাক্তিটি নিশ্চয়-ই বিশ্বাসঘাতক। আমাদেরকে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে নিশ্চয়-ই হত্যা করবে। এই সন্দেহটা আরও দৃঢ় হতে লাগল, কেননা আমাদের সঙ্গে প্রচুর সোনাদানা ছিল। আমরা সমানে প্রশ্ন করতে লাগলাম, কোরেগাঁও আর কতদূর? কতক্ষণে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবো? সেই লোকটিও সমানে উত্তর দিতে লাগল, "আর বেশি দূর নেই, আমরা খুব শীঘ্র পৌঁছে যাব।"

রাত্রি তখন দশটা। তবুও কোরেগাঁওয়ের কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। বাচ্চারা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিল আর গাড়ি চালককে গালাগালি দিতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে এই কান্না হা-হুতাশ চলতে লাগল। গাড়ি চালক কোন উত্তর দিচ্ছিল না। আমরা কিছু দূরে একটা আলো দেখতে পেলাম। গাড়ি চালক বলল, "আলো দেখতে পাচ্ছ? এটা টোল কালেক্টরের আলো। আমরা রাত্রিবেলা সেখানেই কাটাব।" আমরা খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবং আমাদের কান্না বন্ধ হল। আলোটা বেশ দূরে। যেন মনে হচ্ছিল, আমরা বুঝি সেখানে পৌঁছতে পারব না। কালেক্টরের বাসায় পৌঁছতে দুই ঘন্টা লাগল। দূরত্বটা আমাদের আরো চিন্তিত করে তুলছিল। আমরা সমানে গাড়ি চালককে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম : 'এত দেরি হচ্ছে কেন? আমরা কি এক-ই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি' ইত্যাদি।

অবশেষে মধ্যরাত্রে গরুর গাড়ি টোল কালেক্টরের বাড়িতে এসে পৌঁছলো। সেটি পাহাড়ের অপর প্রান্তে এবং পাদদেশে অবস্থিত। সেখানে পৌঁছে দেখলাম আরো প্রচুর গরুর গাড়ি সারা রাতের জন্য সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং খাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু আবার সেই জলের প্রশ্ন। আমরা গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করলাম, "জল পাওয়া যাবে কি?" গাড়ির চালক আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলল যে, টোল কালেক্টর একজন হিন্দু। সুতারাং তোমরা যে মাহার এই সত্য কথা বললে তোমাদের জল পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সে শিখিয়ে দিল "তোমরা বরং বলো, তোমরা মুসলমান, ভাগ্যান্বেষণে বেড়িয়েছ।" ওর পরামর্শ অনুযায়ী আমি টোল কালেক্টরের কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, "জল পাওয়া যাবে কি?' সে জানতে চাইল, "আমরা কারা?" আমি উত্তরে জানালাম "আমরা মুসলমান"। আমি তার সঙ্গে চমৎকার উর্দুতে কথা বলতে লাগলাম। সুতরাং তার মনে আর কোন সন্দেহই রইল না যে আমি একজন মুসলমান। কিন্তু

এতে কোনও কাজ হল না। সে খুব কড়া ভাষায় উত্তর দিল। "কে তোমাদের জন্য জল তুলে রেখেছে? পাহাড়ের ওপরে জল আছে। সেখানে গিয়ে জল খেয়ে এসো। আমার জল নেই।" এই বলে সে আমাকে সরিয়ে দিল। আমি গাড়িতে ফিরে এসে ভাইদের সব কথা জানালাম। আমার ভাই কি ভেবেছিল জানি না। সারা রাস্তা শুধু ও আমাদের শুয়ে কাটাতে বলেছিল।

এর পর গরুর জোয়াল খুলে নেওয়া হল। গাড়ি নিচের দিকে নেমে চলল। আমরা নিচের পাটাতনে আমাদের বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমরা এবারে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। কি হবে তাই নিয়ে আর ভাবলাম না। আমাদের সঙ্গে প্রচুর খাবার, পেটে খিধের আগুন জ্বলছে, অথচ না খেয়ে ঘুমোতে হচ্ছে। কারণ আমরা জল পাইনি। জল কেন পাইনি, কেননা আমরা অস্পৃশ্য। আমাদের মনে শেষে এই ভাবনাটাই কাজ করতে লাগল। আমি বললাম, আমরা এখন নিরাপদ স্থানে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু আমার ভাই নিশ্চয়-ই বিপদের সম্ভাবনা কিছু উপলব্ধি করছিল। ও বলল, "চারজনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক নয়। যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বরং একবার দুজনে ঘুমাক, দুজনে জেগে থাকুক। আর একবার যারা জেগেছিল তারা ঘুমাক, যারা ঘুমিয়েছিল তারা জাগুক।" সুতরাং আমরা রাত্রিটা পাহাড়ের পাদদেশেই কাটিয়ে দিলাম।

সকাল পাঁচটায় আমাদের গাড়িচালক কোরেগাঁও যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলল। আমরা রাজি হলাম না। আমরা বললাম, "সকাল আটটার আগে আমরা রওনা হবো না। আমরা চাই না কোন দুর্ঘটনা ঘটুক।" ও কিছু বলল না। সুতরাং আমরা আটটায় রওনা হলাম। এগারোটায় কোরেগাঁওতে এসে পৌঁছালাম। বাবা আমাদের দেখে অবাক। বললেন, "আমরা যে যাব সেরকম কোনো খবর-ই তিনি পাননি।" আমরা জানালাম, আমরা খবর পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, খবরটা তিনি জানেন-ই না। ক্রমে জানা গেল, দোষটা বাবার চাকরের। সে আমাদের চিঠি পেয়েছিল কিন্তু বাবাকে জানাতে পারে নি।

এই ঘটনাটা আমার জীবনে খুব-ই দাগ কেটেছিল। তখন আমার বয়স মাত্র ন'য়। কিন্তু এই ঘটনা আমার মনে স্থায়ী দাগ কেটেছিল। এই ঘটনার আগে আমি জানতাম যে, আমি একজন নীচুবর্ণের মানুষ। নীচুবর্ণের মানুষরা অসম্মান এবং বৈষম্যের শিকার। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, স্কুলে পড়াশুনায় আমার স্থান অনুযায়ী আমি আমার বন্ধুদের মাঝখানে বলতে পারতাম না। আমাকে এক কোনে বসতে হত। আমি জানতাম, স্কুলে আমাকে পৃথক ধরনের চটের জামা

পড়তে হত। যে সমস্ত কর্মচারী স্কুল পরিস্কার করত, তারা আমার ব্যবহৃত চটের জামাটা স্পর্শ করত না। আমাকে সেটা সন্ধ্যেবেলা বাড়ি নিয়ে যেত হত, পরের দিন স্কুলে আবার সেটিকে বয়ে নিয়ে আসতে হত। আমি দেখেছিলাম, উচ্চবর্ণের ছেলেরা পিপাসার্ত হলে জলের কল খুলে পিপাসা মেটাতো। এরজন্য শিক্ষকের অনুমতিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সব-ই ভিন্ন। আমি জলের কল ছুঁতে পারতাম না। যতক্ষণ না কোনও উচ্চবর্ণের ছাত্র কলের মুখ খুলে দিত ততক্ষণ আমি পিপাসা মেটাতে পারতাম না। আমার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অনুমতিই যথেষ্ট ছিল না। স্কুলের পিওনকে দিয়ে শিক্ষক এ-সব কাজ করাতেন। যদি পিওন না আসত, আমি জল খেতে পারতাম না। অবস্থাটা এমন ছিল, পিওন নেই, সুতরাং জলও নেই। বাড়িতে জামা-কাপড় আমার বোনেরাই পরিষ্কার করত। সাতারাতে কোনও ধোপা ছিল না যে তা নয়। ধোপাকে পয়সা দেবার মতো সামর্থ্য আমাদের ছিল না তাও না। আমাদের বোনেরা নিজেরাই কাপড় ধুতো, তার কারণ ধোপারা কখনও নিম্নশ্রেণী মানুষের কাপড় ধুতো না। আমাদের বড় বোন ক্ষৌর কাজে এতটাই নিপুন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনিই আমাদের সকলের চুল কেটে দিতেন। বোম্বাইতে কোনও ক্ষৌরকার ছিল না যে তা নয়। কিংবা ক্ষৌরকারকে দিয়ে চুল কাটানোর সামর্থ্য আমাদের ছিল না যে তাও নয়। আমরা অস্পৃশ্য শ্রেণীর। সেইজন্য কোনও ক্ষৌরকার আমাদের চুল কাটত না। আমাদের দিদি আমাদের চুল ছেটে দিতেন। এগুলি আমি জানতাম। কিন্তু এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত আহত হয়েছিলাম। এই ঘটনার আগে অস্পৃশ্যদের কি হয় সেটা আমার জানা ছিল। তখন অনেক উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্ন শ্রেণী ছিল, এই ধরনের পরিস্থিতিকে আমি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই ঘটনা আমাকে অত্যন্ত চিন্তিত করল।

□ □ □

দুই

১৯১৬ সালে আমি ভারতে ফিরে এলাম। বরোদার মহারাজ আমাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। আমি ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কের কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করি। ১৯১৭ সালে আমি লন্ডনে ফিরে আসি। লন্ডনের স্কুল অব্ ইকনোমিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পড়ি। ১৯১৮ সালে পড়া শেষ না করেই আমাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। যেহেতু বরোদা রাজ্য আমার ব্যয়ভার নিয়েছিল, সেহেতু সেই রাজ্যের জন্য আমাকে কাজ করতেই হবে। আমি ভারতে পৌঁছেই বরোদা চলে আসি। বরোদা কেন ছেড়েছিলাম, কারণগুলো এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। সেইজন্য এখানে আর সেগুলো বর্ণনা করছি না। বরোদাতে যে সামাজিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আমি সেগুলিই বর্ণনা করছি।

ইউরোপ, আরেরিকায় পাঁচ বছর থাকাকালীন আমার মনে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে কোনওরকম উষ্ণতা আর ছিল না। আমি যে একজন অস্পৃশ্য, ভারতে যে এটা খুব-ই একটা সমস্যা এই কথা আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু যখন ফিরে এলাম সেই প্রশ্ন সমানেই আমাকে বিচলিত করতে লাগল: "কোথায় যাব? কে আমাকে আশ্রয় দেবে?" আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। 'ভিজেজ' নামে হিন্দু হোটেল রয়েছে। সেখানে আমাকে থাকতে দেবে না। নিজের পরিচয় গোপন রেখে সেখানে থাকতে পারি। কিন্তু ভয় থেকে যায় যদি, কেউ আমার পরিচয় জানতে পারে। বরোদায় আমার বন্ধুরা আছে, যারা আমেরিকায় আমার সঙ্গে পড়াশুনা করতে গিয়েছিল। "তাদের কাছে গেলে তারা কি আমাকে খুশি মনে নেবে?" কিন্তু আমি সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তারা নিজেদের বাড়িতে একজন নীচু জাতের বন্ধুকে তুলতে অস্বস্তিবোধ করতে পারে। আমি স্টেশনের ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, কোথায় যাব, কি করব? হঠাৎ মনে হল, ক্যাম্পে কোনও জায়গায় আছে কিনা দেখি। সব যাত্রী চলে গেছে। আমি একা দাঁড়িয়ে। ভাড়া গাড়ির কিছু ড্রাইভার কোন যাত্রী না পেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাদের একজনকে ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "ক্যাম্পে কোনও হোটেল পাওয়া যাবে না-কি?" সে জানাল, একটা পার্শি হোটেল আছে। সেখানে পয়সা দিয়ে থাকা যায়। পার্শিরা হোটেলটি চালায় শুনে আমার মন আনন্দপ্লুত হল। পার্শিরা জরথুশত্রের ধর্মের উপাসক। ওরা অস্পৃশ্য জাত বলে কিছু মানে না। মনে ভরসা নিয়ে এবং কোনও ভয় না পেয়ে আমি ভাড়া গাড়িতে আমার মালপত্র উঠিয়ে দিলাম এবং ড্রাইভারকে বললাম, ক্যাম্পের পার্শি হোটেলে নিয়ে যেতে।

হোটেলটি দোতলা ছিল। একটি পার্শি পরিবার সেটি চালাতো। যারা সেখানে আসত, তিনি তাদের খাবার দিতেন। গাড়ি এসে পৌঁছালে পার্শি তত্ত্বাবধায়ক আমাকে ওপরের তলায় নিয়ে গেল। আমি ওপরে গেলে ড্রাইভার আমার জিনিসপত্র এনে দিল। আমি তাকে ভাড়া দিয়ে দিলে সে চলে গেল। এতক্ষণে আমার মন খুশি হয়ে উঠল। তবু থাকবার একটা সংস্থান হল। ইতিমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক একটা খাতা নিয়ে আমার কাছে এল। আমার সাদ্‌রা এবং কাসতি চিল না, যে দুটি জিনিস প্রমাণ করে যে, এই ব্যাক্তিটি একজন পার্শি। আমাকে দেখেই লোকটি বুঝতে পেরেছে। সে আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, "আমি কে?" আমি জানালাম, আমি একজন হিন্দু। আমি জানতাম না এটি শুধু পার্শিদের জন্যই সংরক্ষিত। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলল, "আমার এখানে থাকা চলবে না।" তার কথায় আমার শিহরণ জাগে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আবার সেই প্রশ্ন মনের মধ্যে জেগে উঠল, 'কোথায় যাব?' আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আবার বললাম, "যদিও আমি হিন্দু, কিন্তু তার কোনও আপত্তি না থাকলে আমার কোন আপত্তি নেই"। সেই লোকটি জানাল, "কি করে সম্ভব। যে কেউ এই পান্থশালায় থাকলে তার নাম খাতায় রেজিষ্ট্রি করতে হয়।" আমি তার অসুবিধাটা বুঝতে পারলাম। আমি তাকে জানালাম, আমি রেজিষ্ট্রি খাতায় নাম লেখার জন্য একটি পার্শি নাম বলতে পারি। "আমার যখন কোনো আপত্তি নেই, তোমার-ই বা কেন আপত্তি থাকবে। আমি যদি এখানে থাকি তোমারও কিছুটা আয় হবে।" আমি দেখলাম, ওর বিশেষ আপত্তি নেই। বহু সময় ধরে ওর কোনও খদ্দের আসেনি। সুতরাং কিছুটা আয়ের সুযোগ ও হারাতে চাচ্ছে না। তখনও এই শর্তে রাজি হল যেন ওকে আমি দেড় টাকা প্রতি দিন থাকার জন্য দিই। এবার রেজিষ্ট্রিতে নিজোক পার্শি বলে পরিচয় দিই। ও নিচে চলে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সমস্যা মিটল। এখন আমি খুশি। কিন্তু হায়। আমি জানতাম না, সেখানে কতটুকু সুখ আমি পেতে পারি। সেখানে থাকবার দুর্দশা বর্ণনা করার আগে আমি সেখানে কিভাবে কাটিয়েছি তার বর্ণনা আগে করি।

হোটেলের দোতালায় ছোট একটি বেডরুম ছিল। পাশে জলের কল সমেত ছোট্ট একটি বাথরুম ছিল। বাকিটা ছিল বড় একটা হল। আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখন বড় হল ঘরটা ভাঙা চেয়ার, তক্তাপোষ, বেঞ্চ, নোংরা জিনিসে ভর্তি ছিল। আমি তার মধ্যে একা থাকতে লাগলাম। তত্ত্বাবধায়ক সকালে এক কাপ চা নিয়ে এল। সকাল সাড়ে ৯টায় প্রাতঃরাশ নিয়ে এল। এরপর এল

রাত সাড়ে আটটায় রাতের খাবার নিয়ে। নেহাৎ না আসলেই নয়, তাই সে আসত। কিন্তু কথা বলার জন্য এতটুকু সময়ও দাঁড়াও না। দিনটা কোনমতে কেটে গেল।

বরোদা মহারাজের মহা-গাণনিকের দফতরে শিক্ষানবিস্ হিসাবে নিয়োজিত হলাম। আমি সকাল দশটায় অফিস যাবার জন্য হোটেল ছেড়ে বেড়িয়ে পড়তাম। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে রাত আটটার সময় আবার সেখানে ঢুকতাম। আবার সেই হোটেলে ফিরতে হবে ভাবলেই আমার ভয় লাগত। কিন্তু এ-ছাড়া আমার কোন জায়গা ছিল না, সেখানে আমি একটু বিশ্রাম নিতে পারি। দোতলার এই বিশাল হল ঘরে একজন ব্যক্তিও ছিল না, যার সঙ্গে আমি দুটো কথা বলতে পারি। আমি সম্পূর্ণ একা। এতবড় হলঘর অন্ধকারে ঢাকা। তখন বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। এমন কি একটি তেলের আলোও ছিল না, যাতে অন্ধকার দূর হতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক একটি হ্যারিকেনের ল্যাম্প আনত। তার আলো বেশি দূর পর্যন্ত যেত না। আমার মনে হত, আমি বোধ হয় কোন ভূগর্ভস্থ কারাগারে নিক্ষেপিত। কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু কেউ ছিল না। কোন মানুষের সাহচর্য না পেয়ে আমি শুধু বই পড়তাম। বইয়ে নিমগ্ন হলে আমার একাকিত্ব দূর হত। কিন্তু বাদুড়ের ঝট্‌পট্ আওয়াজে আমার মন এতটাই বিরক্ত হয়ে পড়ত যে, একটা ঠাণ্ডা শিহরণ আমার মনে প্রবাহিত হত এই কথা ভেবে যে, এ আমি কোথায় আছি, কি পরিবেশে আছি। মাঝে মাঝে রাগ হতো। কিন্তু আমি নিজের রাগকে সংযত করতাম এই ভেবে যে, যদিও এটা নরক কিন্তু তবু তো এটা আশ্রয়। কখনও কখনও কোনও আশ্রয় স্থান আশ্রয়হীনতার চেয়ে ভাল। আমার অবস্থা এতটাই করুণ দিল যে, আমার বোনের ছেলে বোম্বাই থেকে আমার বাকি জিনিসপত্র দিতে এসে আমার অবস্থা দেখে এমনই কাঁদতে লাগল যে, আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। এইভাবে পার্শি সেজে আমি সেকানে দিন কাটাতে লাগালাম। আমি জানতাম, এইভাবে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বেশিদিন থাকা যাবে না। তাই আমি একটি সরকার পরিচালিত বাংলোর খোঁজে ছিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমার প্রয়োজনকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখলেন না। আমি আসল চিঠি পাবার আগে আমার চিঠি অফিস থেকে অফিসে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হোটেলে আমার অবস্থানের একাদশ দিন। আমি প্রাতঃরাশ শেষ করে দফতর যাবার উদ্যোগ নিচ্ছি। আমি সারারাত পড়ব বলে পাঠাগার থেকে যে সব বই

এনেছিলাম, সেগুলো তুলে নিচ্ছি, এমন সময় সিঁড়িতে বেশ কিছু লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ভাবলাম, হয়ত পর্যটকেরা এসেছে। তারা এখানে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম এক ডজন ক্রুদ্ধ, লম্বা পার্শি, হাতে তাদের লাঠি, আমার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। বুঝলাম এরা পর্যটক নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রমাণ পেলাম। তারা সার বেঁধে আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। আমাকে একাধিক প্রশ্নে জর্জরিত করতে লাগল। "তুমি কে? কেনই বা এখানে এসেছ? স্কার্ডভ্রেল। পার্শির নাম ভাড়িয়ে তুমি, এখানে এসে রয়েছ? তুমি পার্শিদের হোটেলকে অপবিত্র করেছ।" আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখে কোনো কথা জোগালো না। আমি পরিচয় গোপন রাখার কথা অস্বীকার করলাম না। এটা নিঃসন্দেহে অন্যায়। এই মিথ্যাচারণ ধরা পড়ে গেছে। আমাকে এই ক্রুদ্ধ জনতা মারতে পারত। মেরে আমার প্রাণনাশ করতে পারত। কিন্তু যেহেতু আমি চুপ করে ছিলাম, তাই ওরা আমাকে মেরে ফেলল না। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কখন এটি ছেড়ে যাব। সেই সময় এই আশ্রয় আমার জীবনের চেয়েও বড় ছিল। এই প্রশ্নটা যে কতটা ভয়ানক ছিল তা আমি জানতাম। আমি নীরবতা ভঙ্গ করে তাদের কাছে আরও এক সপ্তাহ থাকবার অনুরোধ জানালাম। ভাবলাম মন্ত্রণালয়ে এর মধ্যে নিশ্চয়-ই বাংলোর জন্য আমার আবেদন মঞ্জুর হয়ে যাবে। কিন্তু পার্শিরা আমার কথা শুনতে রাজি হল না। তারা আমাকে শেষ ধমকটা দিতে ছাড়ল না। তারা জানিয়ে দিল সন্ধ্যেবেলায় যেন তারা আমাকে দেখতে না পায়। আমি যেন আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই। তারা ভয় দেখিয়ে চলে গেল। আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ়। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আমি সবাইকে শাপান্ত করলাম। এরপর কাঁদতে লাগলাম। সর্বোপরি আমি আমার মূল্যবান সম্পত্তি হারলাম, সেটি হল আমার আশ্রয়। কারাকক্ষের চেয়ে এটি ভালো কিছু ছিল না।কিন্তু তবুও এটি ছিল আমার কাছে অতীব মূল্যবান।

পার্শিরা চলে যাবার পরে আমি এই সমস্যার সমাধানের পথ নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলাম। আমার আশা ছিল, আমি সরকার পরিচালিত বাংলো পেয়ে যাব এবং সমস্যামুক্ত হবো। সুতরাং এটা আমার সাময়িক সমস্যা। আমি ভাবলাম এই সমস্যা সমাধানে কোনো বন্ধুর কাছে যাওয়া যাক। বরোদা রাজ্যে নীচু শ্রেণীর কোনো বন্ধু নেই। অন্য শ্রেণীর বন্ধুরা আছে। তাদের মধ্যে একজন হিন্দু, আর একজন ভারতীয় খ্রীস্টান। প্রথমে হিন্দু বন্ধুর কাছে গিয়ে সমস্যার কথা বললাম। তার মন খুব বড়। তাছাড়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে খুব-ই দুঃখিত হল এবং

ক্রোধান্বিত হল। ও আমাকে বলল, "তুমি যদি আমার বাড়িতে আসো, তাহলে আমাদের কাজের লোকদের চলে যেতে হবে।" আমি বুঝতে পারলাম, বন্ধুটি কি বলতে চাইছে? আমি তাকে আর জায়গার জন্য পীড়াপীড়ি করলাম না। ভারতীয় খ্রিস্টান বন্ধুর কাছে যেতে আমার মন চাইল না। একবার ও আমাকে ওর ওখানে গিয়ে থেকে আসতে বলেছিল। কিন্তু আমি পার্শি হোটেলে থাকব ভেবে ওর অনুরোধ রাখি নি। তার কারণ ছিল ওর অভ্যাসগুলি ঠিক আমার মন মত ছিল না। এখন যদি আমি ওর কাছে যাই, ও তার প্রতিশোধ নেবে। আমি তারপর দফতরে গেলাম। কিন্তু আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। একজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনার পরে তার কাছে কোনরকম ব্যবস্থা করা যায় কিনা জানতে চাইলাম। যখন আমি তাকে এই প্রশ্ন করলাম, তখন সে তার স্ত্রী পরের দিন তার কাছে আসবে জানাল। এবং এই কথাও জানাল যে, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করবে। পরে বুঝেছিলাম সে, যে উত্তরটা দিয়েছিল তা অত্যন্ত কুটনীতিসম্পন্ন। বন্ধুটি মূলতঃ ব্রাহ্মণ ছিল। খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে সে নিজে উদার হলেও তার স্ত্রী এখনও গোঁড়াই থেকে গেছে। সুতরাং বন্ধুটির স্ত্রী একজন নীচু জাতের মানুষকে নিজের ঘরে থাকতে দিতে চায় না। শেষ আশাটাও নির্বাপিত হল। বিকেল চারটের সময় আমি আমার খ্রিস্টান বন্ধুর বাড়ি ত্যাগ করলাম। সেই প্রশ্ন আবার সামনে এসে দাঁড়াল, কোথায় যাব? হোটেল ছেড়ে দিতে হবে। আমার কোন বন্ধুও নেই। সুতরাং বোম্বাই ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখলাম না।

রাত্রি ন'টায়, ট্রেন বরোদা ছেড়ে বোম্বাই রওনা হবে। এখনও পাঁচ ঘন্টা সময় বাকি। এই সময়টা কোথায় কাটাব? সেই হোটেলে অবার ফিরে যাব? না কি বন্ধুর কাছে যাব? হোটেলে ফিরে যেতে সাহস পেলাম না। ভয় হল পার্শিরা নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলবে। বন্ধুর কাছে যেতেও মন সরল না। আমার অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল। এর ওপর আরো শোচনীয় হতে মন চাইল না। ঠিক করলাম, শহর এবং ক্যাম্পের সীমান্তে কামাথি বাগ্ নামে যে পার্কটি আছে, যেখানে বসে পাঁচ ঘন্টা কাটিয়ে দেবো। সেই পার্কে বসে আমি কখনও শূন্য মনে, আমার কি হবে এই কথা ভেবে কখনও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, কখনও মা বাবারা বাল্যকালে কি দুর্দশায় কাটিয়েছেন, এই সব ভাবনা ভেবে কাটিয়ে দিলাম। ঠিক আটটায়, আমি পার্ক থেকে বেড়িয়ে একটি গাড়ি নিয়ে হোটেলে গিয়ে জিনিসপত্র নামালাম। তত্ত্বাবধায়ক বেড়িয়ে আসল। সে কিংবা আমি কেউ-ই একটাও কথা বলতে পারলাম না। সে নিজেকেও এই কাজের জন্য কিছুটা

দায়ী ভাবল। আমি তাকে এই পয়সা মিটিয়ে দিলাম। সে নীরবে তা গ্রহণ করল। আমিও নীরবে চলে আসলাম। আমি বরোদাতে অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। অনেক সুযোগকে উপেক্ষা করেছিলাম। সেই সময় যুদ্ধ চলছিল। ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে অনেক পদ খালি ছিল। আমি লন্ডনের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে চিনতাম। কিন্তু তার কোন চেষ্টাই করিনি। আমি ভেবেছিলাম, আমার প্রথম কর্তব্য বরোদার মহারাজের সেবা করা। কেননা তিনি আমার শিক্ষার খরচ বহন করেছিলেন। কিন্তু মাত্র এগারো দিন পরেই আমাকে বরোদা ছেড়ে বোম্বাই চলে যেতে হচ্ছে।

এক ওজন পার্শি লাঠি হাতে আমার দিকে ধেয়ে আসছে সেই কথা ভাবতে গেলেই আমার শরীর শিউরে উঠে এবং আমি তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছি,। আমার আঠারো বছর বয়সের সেই দৃশ্য এতটুকু মলিন হয়নি। আমি সেইসব দৃশ্য অবিকল বর্ণনা করতে পারি। এবং সে-কথা ভাবলে এখনও আমার চোখে জল এসে পড়ে। সেই প্রথম আমি শিখলাম, একজন অস্পৃশ্য হিন্দুর চোখেও যেমন, পার্শি চোখেও তেমনি।

□ □ □

তিন

১৯২৯ সাল। বোম্বাই সরকার অস্পৃশ্যদের আক্ষেপ কোন কোন জায়গায় তা খতিয়ে দেখবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। আমি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। কমিটি প্রতিটি প্রদেশ ঘুরে ঘুরে অন্যায়, অত্যাচারের কারণগুলি সন্ধান করবে। কমিটিকে ভাগ করা হল। আমাকে এবং অন্য আর একজনকে খান্দেশের দুটি জেলায় পাঠানো হল। আমি এবং আমার সহকর্মী আমাদের কাজের শেষে আলাদা আলাদাভাবে চলে গেলাম। আমার সহকর্মীটি গেল কয়েকজন হিন্দু সাধুর সঙ্গে দেখা করতে। আমি ট্রেনে করে বোম্বাই চলে এলাম। ধুলিয়া লাইনের একটি গ্রামে যাবার জন্য আমি চালিসগাঁওতে নেমে পড়লাম। সেখানে হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই ঘটনাটির তদন্ত করতে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। চালিসগাঁওয়ের নীচুজাতেরা স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করে এবং সেই রাত্রিতে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ জানায়। আমি ভেবেছিলাম, এই সামাজিক বয়কটের ঘটনাটির তত্ত্বাবধান করে আমি বোম্বাই ফিরে যাব। কিন্তু ওদের আগ্রহকে আমি অবহেলা করতে পারলাম না। আমি সেই গ্রামে যাবার জন্য ধুলিয়ার ট্রেন ধরলাম। সেখানে ব্যাপারগুলি দেখে গ্রামের পরিস্থিতি জানালাম এবং পরের ট্রেন ধরে চালিসগাঁওতে ফিরে এলাম।

দেখলাম, চালিসগাঁওয়ের অস্পৃশ্যরা আমার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছে। আমাকে ওরা মালা দিয়ে সম্মানিত করল। মহারাওদা, অস্পৃশ্যদের এলাকা। রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে যেতে হলে নদীর ওপরে একটি পাটাতন পার হতে হয়। সেখানে যাবার জন্য স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। আমাকে মহারাওদাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু এর জন্য কোনরকম তড়িঘড়ি দেখলাম না। বুঝতে পারলাম না কেন আমাকে এইভাবে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এক ঘণ্টা পরে ঘোড়া বাহিত একটি টাঙ্গা প্ল্যাটফর্মে এল। আমি তাতে উঠে বসলাম। টাঙ্গায় আমি আর চালক এই দুজন বসে। অন্যরা পায়ে হেঁটে আসছে। টাঙ্গা ২০০ পদক্ষেপও যায়নি, হঠাৎ একটি মোটর গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। আমার আশ্চর্য লাগল যে চালক রোজ পয়সা নিয়ে যাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে, সে এতটা অনভিজ্ঞ কি করে হয়? দুর্ঘটনা মারাত্মক হতে পারল না, তার কারণ পুলিশের বিকট চিৎকারে গাড়ির চালক পিছিয়ে গেছে।

আমরা কোনমতে নদীর কালভার্টের কাছে এসে পৌঁছালাম। সেতুর ওপরে ছিল বলে এর কোনো রেলিং ছিল না। পাঁচ থেকে দশ ফিট দূরত্বে সার বেঁধে পাথরের স্তূপ ছিল। পাথর দিয়ে এটি তৈরি। আমরা যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম নদীর ওপরে কালভার্টটা ছিল ঠিক তার ডান দিকে। কালভার্টের প্রথম ধাপে ঘোড়া সোজা না গিয়ে ঘুরে গেল এবং হোঁচট খেয়ে পড়ল। টাঙ্গার চাকাটা পাথরের মধ্যে এত জোরে আটকে গেল যে, আমি প্রবল ঝাঁকুনির চোটে কালভার্টের পাথরের রাস্তায় নিক্ষেপিত হলাম। ঘোড়া এবং গাড়ি কালভার্ট থেকে সোজা নদীতে গিয়ে পড়ল। এত জোরে আমি পড়েছিলাম যে, পড়েই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। মহারাওদা ঠিক নদীর ধারে। যারা অনেকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিল, সেইসমস্ত পুরুষ মহিলা, শিশুরা চিৎকার শুরু করে দিল। আমাকে তুলে নিল। আমার প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। পা ভেঙে গিয়েছিল। আমি বেশ কিছুদিন হাঁটতে পারিনি। আমি বুঝতেই পারলাম না, কি করে এমন হল। টাঙ্গা সবসময়ই তো কালভার্টের ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে। চালকরা তো স্বচ্ছন্দে এর ওপরে দিয়ে যাতায়াত করে।

খোঁজ নেবার পর আমি আসল তথ্য জানতে পারি। রেলওয়ে স্টেশনে এতটা বিলম্বের কারণ হল, টাঙ্গাওয়ালারা একজন নীচু জাতের মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে সম্মত হচ্ছিল না। এতে তাদের সম্মানে বাধছিল। মাহার-রাও আমি হেঁটে তাদের এলাকায় যাই, এটা মেনে নিতে পারছিল না। এতে আমার সম্মান রক্ষা হবে না, তারা মনে করছিল। শেষে একটা সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল। টাঙ্গার মালিক টাঙ্গা ভাড়া দিতে রাজি হল কিন্তু চালাতে রাজি হল না। মাহাররা টাঙ্গা ভাড়া নিতে পারে কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাহাররা এটিকেই সমাধানের সহজ উপায় ভাবল। কিন্তু ওরা এই কথা ভুলে গিয়েছিল যে, যাত্রীর সম্মানের চেয়ে তার নিরাপত্তা আরো বেশি জরুরি। যদি তারা সেই চিন্তা করত, তাহলে অন্তত তারা এমন চালকের খোঁজ করত যে নিরাপদে আমাকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে পারত। কেউ-ই চালাতে জানত না, কেননা এটি তাদের পেশা নয়। তারা নিজেদের মধ্যেই ঠিক করে নিল, কে গাড়ি চালাবে। একটি লোক হাতে বলগা তুলে নিল, অমনি গাড়ি চলতে শুরু করল। লোকটা ভাবল, এটা এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে তার দায়িত্ব কতখানি বুঝতে পারল। এবং এত ভয় পেয়ে গেল যে গাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন চেষ্টাই করল না। চালিসগাঁওর মাহাররা আমার

সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে আমার জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। সেই থেকেই আমি শিক্ষা পেলাম যে, একজন হিন্দু টাঙ্গাওয়ালা দৈহিক পরিশ্রম করে জীবন কাটালেও একজন নীচু জাতের ব্যারিস্টারের চেয়েও তার সম্মান বোধ বেশি।

□ □ □

চার

১৯৩৪ সালে, আমার কয়েকজন সহকর্মী দলিত শ্রেণীর এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সেইসব এলাকায় যেতে আগ্রহী হল, অবশ্য আমি যদি তাদের সঙ্গে যাই তবেই। আমি সম্মত হলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল, যে কোনো উপায়েই হোক আমি ভেরুলের বৌদ্ধ গুহা সফর করবই। স্থির হল আমি নাসিকে যাব। ওরা আমার সঙ্গে নাসিকে দেখা করবে। ভেরুলে যেতে হলে ঔরঙ্গাবাদে যেতেই হবে। ঔরঙ্গাবাদ হায়দ্রাবাদের মুসলমান রাজ্য। এবং নিজামের অধীনে। ঔরঙ্গাবাদ যাবার পথে হায়দ্রাবাদে রাজ্যের একটি শহর দৌলতাবাদকে অতিক্রম করতে হয়। দৌলতাবাদ ঐতিহাসিক শহর। একসময় হিন্দু রাজা রামদেও রাই এর রাজধানী ছিল। দৌলতাবাদের দুর্গ একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধ। কোনো পর্যটক-ই এর কাছাকাছি গিয়ে একে পরিদর্শন না করে যায় না। আমরা সকলেই দৌলতাবাদ যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমরা কিছু বাস এবং কিছু গাড়ি ভাড়া করলাম। সংখ্যায় আমরা ত্রিশজন ছিলাম। আমরা নাসিক থেকে ইওলাতে রওনা হলাম। কেননা ইওলা ঔরঙ্গাবাদের পথেই পড়ে। আমাদের সফর কর্মসূচি আগে থেকে ঘোষিত হয়নি এবং ইচ্ছে করেই তা হয়নি। কেননা একজন অস্পৃশ্য যাত্রী ভারতের কোনো প্রান্তে যদি অসুবিধার সম্মুখীন হয়, সেই ভয়ে আমরা ছদ্মবেশেই যাব স্থির করেছিলাম। শুধুমাত্র যে সব জায়গায় আমরা থামব, সেইসব কেন্দ্রের লোকদের খবর পাঠানো হয়েছিল। যার ফলে নিজাম রাজ্যের বহু গ্রাম অতিক্রম করলেও কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। দৌলতাবাদে অন্যরকম ব্যবস্থা ছিল। সেখানকার লোকদের আমরা আসছি জানানো হয়েছিল। তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং শহরের মুখে সমবেত হয়েছিল। তারা আমাদেরকে নামতে অনুরোধ করল। চা ও খাবার খেয়ে তরপর কেল্লা দেখতে যেতে বলল। কিন্তু আমরা তাদের প্রস্তাবে রাজি হলাম না। আমাদের খুব-ই চা পিপাসা পেয়েছিল কিন্তু অন্ধকার হবার আগেই আমরা দুর্গটাকে ভালভাবে দেখতে চাচ্ছিলাম। সেই অনুযায়ী আমরা চালকদের নির্দেশ দিলাম সোজা কেল্লায় নিয়ে যেতে। সেটা রমজানের মাস। মুসলমানদের উপবাসের মাস। দুর্গের গেটের সামনে ছোট জলাধার। জল কানায়-কানায় পূর্ণ। চারপাশে পাথর দিয়ে তৈরি রাস্তা। কোনো কিছু না ভেবেই আমাদের মধ্যে কয়েকজন জলাধার থেকে জল নিয়ে হাত, পা, মুখ, ধুলো। এই সবের পর আমরা কেল্লার দ্বারের কাছে গেলাম। চারপাশে অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যরা। তারা

বড় দরজাটা খুলে দিল। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছি যে, কেল্লার ভেতরে যেতে হলে কি ধরনের নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। ইতিমধ্যে সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমান চেঁচাতে লাগল, অস্পৃশ্যরা জলাধারের জলকে অপবিত্র করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বৃদ্ধ মুসলমানেরা একইভাবে চেঁচাতে লাগল এবং আমাদের গালাগালি দিতে লাগল। "অস্পৃশ্যরা বড্ড বেড়ে গেছে। ওরা নিজেদের ধর্মকে ভুলতে বসেছে। ওদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।" তারা নানা ধরনের অসভ্যতা করতে লাগল। বললাম, আমরা বাইরে থেকে এসেছি। সেইজন্য স্থানীয় নিয়ম-কানুন জানি না। তারা স্থানীয় অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রোষ প্রকাশ করতে লাগল। ওরাও গেটের কাছে এসে সমবেত হয়েছিল। "তোমরা কেন বাইরের লোকদের জানাও নি, এই জলাধার অস্পৃশ্যরা স্পর্শ করতে পারবে না।" তারা সকলে স্থানীয় অস্পৃশ্যদের এইসব প্রশ্ন করতে লাগল। বেচারারা জানতও না, কখন আমরা জলাধারের কাছে প্রবেশ করেছিলাম। এটা আমাদের দোষ। নিয়ম জেনে সবকিছু করা উচিত ছিল। যারা প্রতিবাদ করল, তাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু মুসলমানেরা আমার ব্যাখ্যা শুনতে প্রস্তুত নয়। তারা সকলে তাদেরকে এবং আমাদেরকে গালাগালি করতে লাগল। গালাগালিগুলি এতই নিম্নমানের ছিল যে, আমরা ক্রমেই উত্যক্ত হয়ে উঠছিলাম। দাঙ্গা কিংবা খুন খারাপি হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে সংযত করে নিলাম। আমরা অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে চাইছিলাম না। কেননা এতে আমাদের আর কোথাও ঘুরে বেড়ানো হত না।

জনতার মধ্য থেকে একজন তরুণ যুবক সমানে বলে যেতে লাগল, প্রত্যেকের নিজের ধর্ম অনুযায়ী চলা উচিত। অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের জলধারের জল স্পর্শ করা উচিত নয়। আমার রাগ হতে লাগল। আমি একটু রাগান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম "তোমার ধর্ম তোমাকে কি শিক্ষা দেয়? একজন অস্পৃশ্য যদি মুসলমান হয়, তুমি কি তাকে জলাধারের জল ব্যবহার করতে দেবে না?" এই সোজাসুজি প্রশ্ন মুসলমানদের ওপরে কিছুটা প্রভাব ফেলল। ওরা কোন উত্তর দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সেই দ্বাররক্ষীর দিকে তাকিয়ে আবারও রাগত কণ্ঠে আমি বললাম, "তোমরা আমাদের কেল্লার ভেতরে ঢুকতে দেবে কি না? যদি ঢুকতে না দাও, আমরা দেখি কি করতে পারি।" দ্বাররক্ষী আমার নাম জানতে চাইল। আমি একটি কাগজে লিখে দিলাম। সে ভেতরে গিয়ে পরিচালকের অনুমতি নিয়ে এল। আমাদের ভেতরে দেওয়া হল কিন্তু জল স্পর্শ করতে নিষেধ করা

হল। আদেশ লঙ্ঘন করা হচ্ছে কিনা, তার নজরদারি করার জন্য একজন অস্ত্র সজ্জিত সেনাকেও সঙ্গে পাঠানো হল।

আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখালাম। একজন ব্যক্তি যিনি হিন্দুর কাছে অস্পৃশ্য, তিনি একজন পার্সির কাছেও অস্পৃশ্য। একজন অস্পৃশ্য যিনি হিন্দুর কাছে ছোট—তিনি মুসলমানের কাছেও ছোট।

পাঁচ

পরের ঘটনাটা সমান আকর্ষণীয়। এটি কাথিওয়ার একটি গ্রামের একজন অস্পৃশ্য স্কুল শিক্ষকের ঘটনা। এটি ১৯২৯ সালের 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র দ্বাদশ সংখ্যায় একটি চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন গান্ধীজি। এতে সেই শিক্ষক তার অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য একজন হিন্দু ডাক্তারকে আসতে বলায় কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। তার স্ত্রী তখন একটি শিশু সন্তান প্রসব করেছিলেন। চিকিৎসার অভাবে তার স্ত্রী এবং সন্তান মারা যায়। সেই চিঠির বিষয়বস্তু এইরকম ছিল :

"এই মাসের পাঁচ তারিখে আমার একটি শিশু জন্মালো। সাত তারিখে আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার তরল বাহ্য হতে লাগল। জীবনীশক্তি প্রায় কমে আসতে লাগল। বুক জ্বালা করতে লাগল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হতে শুরু করল। পাঁজরে অসহ্য ব্যাখ্যা। আমি ডাক্তার ডাকতে গেলে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, একজন হরিজনের বাড়িতে তিনি চিকিৎসা করতে যাবেন না, এমনকি শিশুটিকেও দেখতে যাবেন না। তখন আমি নগরশেঠ ও গরসিয়া দরবারে গেলাম এবং তাদের সাহায্য চাইলাম। নগরশেঠ ডাক্তারকে দুটাকা দিতে বললেন। ডাক্তার এতে সম্মত হলেও একটি শর্তে দেখতে চাইলেন যে, রোগীকে হরিজন কলোনির বাইরে এনে দেখাতে হবে। আমি সেইমত আমার স্ত্রী ও সদ্যোজাত শিশুকে হরিজন কলোনির বাইরে এনে দেখালাম। তখন ডাক্তার থার্মোমিটারটি একজন মুসলমানের হাতে দিলেন। সে আমার হাতে দিল, আমি আমার স্ত্রীকে দিলাম। এই প্রক্রিয়ায় থার্মোমিটারটি আবার ফেরতও দেওয়া হল। তখন রাত আটটা। ডাক্তার ল্যাম্পের আলোতে থার্মোমিটার দেখে বললেন, রোগীর নিমুনিয়া হয়েছে। তারপর ডাক্তার চলে গেলেন এবং ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন। আমি বাজার থেকে লিনসিড এনেছিলাম এবং রোগীকে তা দিয়েছিলাম। ডাক্তার পরে আর দেখতে আসেননি। কিন্তু আমি তাকে দু'টাকাই দিয়েছিলাম। রোগটি খুব ভয়ানক ছিল। এক্ষেত্রে ঈশ্বরই একমাত্র সহায় হতে পারতেন।

আমার স্ত্রীর জীবনের আলো নিভে গেল। তিনি দুপুর দু'টোয় মারা গেলেন।"

সেই অস্পৃশ্য স্কুল শিক্ষকের নাম উল্লেখ ছিল না, ডাক্তারের নামেরও উল্লেখ ছিল না। সেই শিক্ষক অত্যাচারিত হবার ভয়েই নাম উল্লেখ না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সুতরাং ঘটনাটি নিয়ে বিবাদের কোন অবকাশ ছিল না।

কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ডাক্তার শিক্ষিত হয়েও একজন মুমূর্ষ মহিলাকে চিকিৎসা করতে এবং থার্মোমিটার দিতে অস্বীকৃত হলেন। এর ফলে সেই মহিলার মৃত্যু হল। নিজের পেশার মূল শর্তকে সরিয়ে দিতে তার বিবেকে অতটুকু বাঁধল না। একজন অস্পৃশ্যকে ছোঁয়ার চেয়ে অমানবিক হতে একজন হিন্দুর এতটুকু বাধে না।

□ □ □

ছয়

আরও একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ১৯৩৮ সালের ৬ই মার্চ, শ্রী ইন্দুলাল যাজ্ঞিকর সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ের কাসারওয়াদি দাদারে ভাঙ্গিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় একজন ভাঙ্গি তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছিলেন।

"আমি ১৯৩৩ সালে মাতৃভাষায় ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাস করেছিলাম। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত আমি ইংরেজি পড়েছিলাম। আমি বোম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যালিটিতে শিক্ষকের চাকরির জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু পদ শূন্য না থাকায় সেই চেষ্টা সফল হয়নি। তারপরে আমি আমেদাবাদের অনুন্নত শ্রেণীর দফতরে তালাতির (গ্রাম পাটোয়ারি) পদের জন্য আবেদন করেছিলাম। এটি আমি পেলাম। ১৯৩৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি আমি খেড়া জেলার বরসাদ তালুকের মামলতদারের দফতরে তালাতির পদে নিযুক্ত হলাম।

আমার পরিবার মূলত গুজরাট থেকেই এসেছিল। কিন্তু আমি কখনও গুজরাটে আগে যাইনি। এই প্রথম আমি সেখানে গেলাম। আমি জানতাম না যে, সরকারি দফতরে এই অস্পৃশ্যতা মানা হয়। আমার আবেদনেই লেখা ছিল যে, আমি একজন হরিজন। সেইজন্য আমার সহকর্মীরা আগে থেকেই আমার পরিচয় জানত। সেইজন্য আমি যখন তালাতি পদের দায়িত্ব নিতে সেখানে যাই, মামলতদার দফতরের কেরানির ব্যবহার দেখে আমি আশ্চর্য হই।

কারকুন খুব উদ্ধতভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করেন "আমার পরিচয় কি? আমি উত্তর দিই, "স্যার আমি একজন হরিজন।" তিনি বললেন, "এখানে থেকে সরে যাও। দূরে দাঁড়িয়ে থাক। আমার এত কাছে আসার স্পর্ধা হল কি করে? এটা দফতর তাই। যদি বাইরে হত, আমি ছ'টা লাথি মারতাম। কত বড় স্পর্ধা, চাকরির জন্য এসেছে?" এরপর সে আমাকে আমার শংসাপত্র এবং তালতি পদের নিয়োগে পত্রটি মাটিতে ফেলতে বলল। সে সেখান থেকে সেটি তুলে নিল। আমি যখন বরসাদের মামলাতদার দফতরে কাজ শুরু করলাম, তখন ভীষণ পানীয় জলের সমস্যা ভোগ করেছি। বারান্দায় একটি পাত্রে পানীয় জল ভরে রাখা হত। এরজন্য একটি লোক নিয়োগ করা ছিল। সে কেরানিদের দফতরে প্রয়োজন মত জল দিত। সেই লোকটি না থাকলে সবাই সেই পাত্র থেকে জল নিয়ে যেত। কিন্তু আমি তা পারতাম না। আমি সেই জলের পত্রটি ছুঁতে পারতাম না। কেননা তাতে সেটি অপবিত্র হয়ে যাবে। ফলে আমাকে সেই

লোকটির দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হত। আমার ব্যবহারের জন্য একটি জং ধরা পাত্র রাখা হত। কেউ সেটা ছুঁতো না, কিংবা পরিষ্কার করত না। সেই পাত্রের মধ্যে সেই জলের লোকটি জল ঢিলে দিয়ে যেত। কিন্তু আমি সেই লোকটি উপস্থিত থাকলেই জল পেতাম। সেই লোকটিও আমাকে জল দিতে চাইত না। যখনই ও দেখত, আমি জলের জন্য আসছি তখনই সে পালিয়ে যেত। ফলে অনেকদিনই আমার জল খাওয়া হত না।

বাসস্থান নিয়েও আমার বেশ কিছু সমস্যা হয়েছিল। আমি বরসাদে প্রথম এসেছি। কোন হিন্দু আমাকে ভাড়া দেবে না। কোন নীচুজাতের মানুষও হিন্দুদের ভয়ে আমাকে ভাড়া দিতে চাইল না। আর তা ছাড়া, আমার এই চাকরি পাওয়াটাও তারা সুনজরে দেখেনি। আরো সমস্যা ছিল খাবার পাওয়া। এমন কোন স্থান বা ব্যক্তি পাচ্ছিলাম না, যার কাছে আমি খাবার পেতে পারি। আমি সকাল সন্ধ্যে ভাজা কিনে খেতাম এবং মামলতদারের' দফতরের বারান্দায় রাত্রিতে ঘুমিয়ে থাকতাম। এইভাবে চারদিন কেটে গেল। ক্রমে আমার অসহ্য মনে হতে লাগল। তখন আমি আমার পৈত্রিক গ্রাম জেনট্রালে গেলাম। বরসাদ থেকে এটি ছ' মাইল দূরে। প্রতিদিন আমি এগারো মাইল হাঁটতাম। এইভাবে দেড়মাস কেটে গেল।

মামলতদারের পরে আমাকে একজন তালাতির কাছে কাজ শিখতে পাঠানো হল। এই তালাতি তিনটি গ্রামের দায়িত্বে ছিল—জেনট্রাল, খাপুর এবং সেজপুর। জেনট্রালেই তার সদর দফতর ছিল। আমি জেনট্রালে সেই তালাতির কাছে দুই মাস ছিলাম। সে আমাকে কিছুই শেখায় নি। আমি গ্রামের দফতরে কখনই যেতাম না। গ্রামের যিনি প্রধান, তিনি ভীষণ হিংস্র ছিলেন। একদিন তিনি বলেছিলেন, "এই তোমরা, তোমাদের পিতা, তোমাদের মাতা সকলেই মেথর ছেলে। তোমরা গ্রামের দফতর পরিস্কার করতে। তোমরা এখন এসেছ আমাদের সমান সমান চাকরি করতে? তোমার এই চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

একদিন তালাতি সেজপুরে আমাকে গ্রামের জনসংখ্যার তালিকা তৈরির জন্য ডেকে পাঠালো। জেনট্রাল থেকে আমি সৈজপুরে গেলাম। আমি দেখলাম গ্রাম প্রধান এবং তালাতি কিছু কাজ করছে। আমি দফতরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ওদের 'সুপ্রভাত' বলে শুভেচ্ছা জানালাম। ওরা ফিরেও দেখল না। আমি প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। এই জীবন সম্পর্কে আমার ঘেন্না এসে গিয়েছিল। এত অপমান এবং অবজ্ঞা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।

সেখানে একটি চেয়ার ছিল। আমি তার ওপরে বসে পড়লাম। আমাকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে, গ্রাম প্রধান এবং তালাতি আমাকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বিরাট জনতা আমাকে ঘিরে ধরল। এই জনতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গ্রামের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। আমি বুঝতে পারছিলাম না, একজন শিক্ষিত লোক কেন এভাবে এত লোককে জড়ো করছে। ক্রমে শুনতে পারলাম, চেয়ারটি সেই ভদ্রলোকের। তিনি অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে গালাগালি দিতে লাগালেন। রাভানিয়াকে (গ্রামের চাকর) ডেকে সে বলল, /এই নোংরা কুকুরটাকে কে চেয়ারে বসতে বলেছে?" রাভানিয়া আমাকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দিল এবং চেয়ারটা টেনে নিল। আমি মাটিতে বসে পড়লাম। সমস্ত জনতা আমাকে ঘিরে ধরল। ক্রুদ্ধ জনতার মধ্যে কেউ আমাকে গালাগালি দিল। কেউ ধারিয়া(ছোরার মত ধারালো অস্ত্র) দিয়ে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলার ভয় দেখালো। আমি তাদেরকে আমাকে ক্ষমা করবার জন্য অনুরোধ করলাম। এতেও ওদের রাগের উপশম হল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না, নিজেকে কি ভাবে রক্ষা করব। হঠাৎ মনে হল, মামলাতদারকে চিঠি লিখে আমার অবস্থা জানাব এবং তাকে বলব, আমি জনতার হাতে প্রাণ দিলে কি করে আমার দেহকে উদ্ধার করা যাবে? আমার মনে আশা জন্মাল। আমি যদি মামলতদারকে আমার অবস্থা জানাচ্ছি এই কথা তারা জানতে পারে, হয়ত তারা আর এই ধরনের ব্যবহার করতে সাহস পাবে না। আমি রাভানিয়াকে একটা কাগজের টুকরো দিতে বললাম। আমি আমার নিজের কলম দিয়ে বড় বড় করে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখলাম, যাতে সবাই পড়তে পারে।

প্রতি, মামলতদার, তালুক বরসাদ,

"পারমার কালিদাস শিবরামের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি খুব বিনীতভাবে একটি খবর আপনাকে জানাতে চাই। আজ মৃত্যুর করাল হাত আমাকে স্পর্শ করেছে। আমি যদি আমার পিতামাতার কথা শুনতাম, আমার এই রকম হত না। আপনি করুণা করে আমার পিতা-মাতাকে আমার মৃত্যুর খবরটি পৌঁছে দেবেন।"

গ্রন্থগারিক চিঠিটি পড়ল। এরপর আমাকে চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলতে বলল। তারা আমাকে অজস্র অপমান করল। "তুমি চাইছে, আমরা তোমাকে তালাতি বলে সম্মোধন করি। তুমি একজন ভাঙ্গি হয়ে আমাদের চেয়ারে বসছে?" আমি তাদের কাছে অনুরোধ করলাম, আর কখনও এরকম হবে না। এবং প্রতিশ্রুতি

দিলাম আমি চাকরিটা ছেড়ে দেব। সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। তারপর সবাই সেখান থেকে চলে যায়। তখনও তালাতি সেখানে এসে পৌঁছায়নি। এরপর পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে আমি সেখান থেকে বোম্বাই ফিরে আসি।

□ □ □

অংশ ২

অংশ ২

১) ব্রিটিশ ভারতের সংবিধান

২) সংসদীয় ব্যবস্থার ওপরে কিছু নোট

৩) ভারতের ইতিহাসের ওপরে কিছু নোট

৪) মনু ও শূদ্র

৫) সামাজিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ

৬) হিন্দু

৭) হতাশা

৮) রাজনৈতিক অবদমনের সমস্যা

৯) কোনটা খারাপ? দাসত্ব না অস্পৃশ্যতা।

১

ব্রিটিশ ভারতের সংবিধান

১) *ভূমিকা ঃ বিষয়ের সীমাবদ্ধতাগুলি*

ব্রিটিশ চালিত ভারতবর্ষের সংবিধান "ভারত শাসন আইন" ১৯১৯ নামক ঘোষণায় বিবৃত রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ছাত্র যে সংবিধানের মাধ্যমে নিজেদের কথা জানাবে, ইংরেজি সংবিধানের ছাত্র সেই সংবিধানের মাধ্যমে নিজেদের কথা জানতে পারবে না। তার অবস্থা অনেকটা আমেরিকা-সংবিধানের ছাত্রের মত, যে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে গৃহীত বিধিবদ্ধ আইনকে বুঝতে পারে এবং তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে এর অতিরিক্ত কিছু পারে না। এই ভাবনা থেকে বুঝতে হলে সাংবিধানিক আইন কি এবং এর আওতায় পড়ে এমন প্রশ্নগুলি কি হতে পারে এইসব প্রশ্ন তোলা অমূলক। দ্বিতীয়ত ধরে নেওয়া যাক, সাংবিধানিক আইনের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এই অনুসন্ধানের ফলে এই বিষয়ের আলোচনার প্রারম্ভিক অংশ বুঝা যাবে, না শেষাংশ বুঝা যাবে। স্বর্গত অধ্যাপক মৈতল্যান্ড তাঁর ইংরেজি সাংবিধানিক ইতিহাসে যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে পরবর্তী অংশকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যায় কেন এগুলি উপযোগী নয়, তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

কারণগুলি প্রথমেই উত্থাপিত হওয়া উচিত। সাংবিধানিক আইন কি, এই প্রশ্ন কেন উঠছে? যার মধ্য দিয়ে আমরা একটি কি দুটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমাদের বিষয়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পরিষ্কার জানতে পারি। 'ভারত শাসন আইন'-এ বন্দী-প্রদর্শনের আজ্ঞালেখ এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক নিম্ন আদালতে নির্দেশ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা নেই। সেখানে সামরিক আইন কিংবা প্রশাসনিক আইন সম্পর্কেও বলা হয়নি। দেশের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী যিনি তাঁর অধিকার কি রকম হবে, ভারত সরকার অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করবে, সেই সব কিছুই বলা নেই। এইসব বিষয়গুলি আলোচনার প্রয়োজন আছে কি নেই? ভারতীয় সাংবিধানিক আইনের আওতায় এগুলি পড়ে কি পড়ে না? অন্যান্য দেশের সংবিধানিক আইনে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা বিচার

করে এ কথা বলা যায় যে, এই সব দেশে সাধারণের মতামতকে ভিত্তি করেই সাংবিধানিক আইন গড়ে উঠেছে। 'ভারত শাসন আইন'-এ যদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, সংবিধানিক আইনের সমীক্ষায় যদি এটা গৃহীত হয় তবে এই বিষয়ের সংস্থার প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংবিধানিক আইন কি, এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে দিয়েছে। অস্টিন এবং মৈতল্যান্ড দু ধরনের ব্যাখ্যা পোষণ করতেন। অস্টিন জনগণের আইন কিংবা রাজনৈতিক পরিস্থিতির আইনকে দুভাবে ভাগ করেছেন—সংবিধানিক আইন এবং প্রশাসনিক আইন। তাঁর মতে, সাংবিধানিক আইন, যাঁরা দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবেন, সেইসমস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তির সমষ্টিকে স্থির করবে। এই সমস্ত ব্যক্তি কি ভাবে তাঁদের ক্ষমতা ভোগ করবেন তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। অস্টিনের সংবিধানিক আইনের ব্যাখ্যায় দেশের সার্বভৌম শক্তির কাঠামো এবং গঠন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের উল্লেখ রয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ শক্তি যে সব সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করবে তিনি সংবিধানিক আইনের ব্যাখ্যায় সেগুলি বাদ দিয়েছেন। অস্টিন নিজের নীতির যৌক্তিকতাকে নির্ভর করে সাংবিধানিক আইনের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। মৈতল্যান্ড সাংবিধানিক আইনের সীমাবদ্ধতাকে বিবেকের ব্যাপার বলে মনে করতেন। মৈতল্যান্ড সাংবিধানিক আইনে সর্বোচ্চ শক্তির নিয়মগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি প্রিভি কাউন্সিল, রাজ্যগুলির দফতর, রাজ্যের সচিবদের, বিচারকদের, জাস্টিস্ অব্ দ্য পিস্ (Justices of the Peace) আইনের অভিভাবক, স্বাস্থ্য ও পুলিশের পর্ষদগুলিকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর থেকে দুটি চূড়ান্ত মতবাদ পাওয়া যায়। আইন যেখানে সংক্ষেপ করেছেন, মৈতল্যান্ড সেখানে বিস্তৃত করেছেন।

অধ্যাপক হল্যান্ডের মতবাদে আবার মধ্যপথ অবলম্বনকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একজন ব্যক্তি মতামত দিতে পারবে, রাজ্যকে সাহায্য করতে পারবে এবং অপরের কাজ করবার অধিকার থাকবে। একজন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির ব্যাপারে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, তা জনগণ সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়বে। রাষ্ট্র নিজের প্রজাদের বিরুদ্ধে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, সব-ই জনগণ সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়বে। সংবিধানিক আইন নিঃসন্দেহে জনগণ সংক্রান্ত আইনের অংশ এবং এটি রাষ্ট্র নিজের জনগণের বিরুদ্ধে কি ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং জনগণ রাজ্যের বিরুদ্ধে কি ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, তা-ই নিয়েও আলোচনা করবে। কিন্তু সংবিধানিক আইনের আওতায় থাকবে রাষ্ট্রের সংস্থাগুলির সম্পর্কে বিবরণ। কেননা রাজ্য হল কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান, যে শাস্তি দেবার অধিকার, সম্পত্তি

রক্ষার অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, ব্যক্তি এবং দুজন ব্যক্তির মধ্যে অধিকার এবং কর্তব্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি জানাতে পারে। অতএব এই কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান কি ভাবে গঠিত হয়েছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব সাংবিধানিক আইনের সমীক্ষা তিনটি বিষয় নিয়ে গঠিতঃ (১) রাষ্ট্রের সংস্থা (২) প্রজাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অধিকার (৩) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রজাদের অধিকার। 'ভারত শাসন আইন'-এর ধারার ওপরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংবিধানিক আইনের সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ সম্পর্কে আমি এই প্রস্তাবগুলিই করেছিলাম। অধ্যাপক অ্যানসন (Anson) তার ইংরেজি সংবিধানের ব্যাখ্যায় এই মত-ই পোষণ করেছেন।

অন্য একটি প্রশ্নও মনে আসা স্বাভাবিক। এই বিষয়ের চর্চা কি ঐতিহাসিক না বিবৃতিমূলক হবে? 'ভারত শাসন আইন'-এর ধারায় বলা হয়েছে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে যে সব প্রতিবিধান পাওয়া গেছে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেগুলি মেনে নেওয়া হবে। 'ভারত শাসন আইন'-এর ধারায় আরোও বলা হয়েছে যে—

"হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের সেই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, যেগুলিকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছে। 'ভারত শাসন আইন'-এর ধারায় এক-ই ধরনের বিভিন্ন বিভাগের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যা করার জন্য দুটির উল্লেখ-ই যথেষ্ট যে, ইতিহাসকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ভারতের সংবিধান নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা বলা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে কি কি প্রতিবিধান ছিল তা খতিয়ে দেখতে গেলে রাষ্ট্রের সচিবের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানগুলি বুঝা দরকার। সুপ্রিম কোর্টকে কি কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, এই ব্যাপারটি অবগত না হয়ে কেউ হাইকোর্টের ক্ষমতাগুলি বুঝতে পারবেন না। কিছু ইতিহাসের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সংবিধানিক আইনের ব্যাখ্যায় এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা প্রতিটি অংশের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাই দেওয়া হচ্ছে। অতীতের সব ঘটনার বর্তমানে কোনো প্রয়োজন নেই। বর্তমানের একান্ত অংশটিই উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন বিশেষ কোনো প্রশ্নের প্রয়োজন হয়েছে আমি তখন যথার্থ বোধগম্যের জন্য ঐতিহাসিক উল্লেখের প্রস্তাব দিয়েছি।

□ □ □

২

সংসদীয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সংসদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে কত ধরণের পদ্ধতি আছে তা নির্ধারিত হয়।

(১) সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল:- যে কোনো ধরনের প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কে মতামত প্রকাশ ও সমালোচনা করার ক্ষমতা।

(২) আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা

(৩) প্রশাসন চালানোর জন্য অর্থ প্রদানের ক্ষমতা।

(১) মতামত দানের ক্ষমতা অথবা প্রশাসনের কাজের সমালোচনা। ব্যবসার অনুমোদনের নিয়ম-কানুন।

(১) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা

(২) সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(৩) সংসদ বাতিল করার প্রস্তাব পেশ করা

(৪) সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা

(১) প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ক্ষমতা—

নিয়ম ৭

এটি নিম্নলিখিত বিধি-নিষেধগুলির ওপর নির্ভরশীল।

সংসদ পরিচালনার নিয়মাবলী

(১) বিষয়ের ক্রমানুবর্তিতা

(১) এক ঘন্টা প্রশ্ন

(২) বিধেয়ক

(৩) জমে থাকা বিধেয়কের সংশোধনের প্রস্তাব

(৪) প্রস্তাবনা

যে কোনো বিষয়কে রাষ্ট্রপতি অগ্রাধিকার দিতে পারেন।

(১) বিধেয়ক, প্রস্তাবনা এবং প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার।

(১) বিধেয়ক এবং প্রস্তাব উত্থাপন। কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অগ্রাধিকার।

(২) প্রস্তাবনা

ভোটের দ্বারা অগ্রাধিকার নির্ধারণ

কোরাম (নূনতম সদস্য)

বোম্বাইতে পঁচিশ জন সদস্য।

যদি ন্যূনতম সদস্য না থাকে তবে রাষ্ট্রপতি পরের দিন পর্যন্ত সভা মূলতুবি রাখতে পারবেন।

ধারা ২৭

দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পাশ করা হয়।

(১) সাধারণ আলোচনা এবং

(২) ভোটের মাধ্যমে বাজেট পাশ

বাজেট সম্পর্কিত আলোচনা কতদিন চলবে তা রাষ্ট্রপতি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী স্থির করতে পারেন না।

সাধারণ আলোচনা চলাকালীন কোন প্রস্তাব আনা যাবে না কিংবা ভোটের জন্য কোনও বাজেট পেশ করা যাবে না।

ধারা ২৯

অনুদানের অনুমোদন

Voting of demand এর জন্য রাষ্ট্রপতি বারো দিনের বেশি সময় নির্ধারন করতে পারবেন না। যে কোনো একটির জন্য দুদিনের বেশি ধার্য্য করা যাবে না। শেষ দিনে রাষ্ট্রপতি demand for grant সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ নেবেন।

ধারা ৩০

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো উপযোজন সম্পর্কিত প্রস্তাব উপস্থাপন করা যাবে না এবং রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতির কথা পর্ষদকেও জানাতে হবে। ব্যয় বরাদ্দের

পরিমাণ কমানো কিংবা ব্যয়-বরাদ্দের কোনো একটি বিষয় কাজ দেওয়া কিংবা কমানো সম্পর্কিত প্রস্তাব আনা যেতে পারে। কিন্তু ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো কিংবা পরিবর্তন সম্পর্কিত কোনো প্রস্তাব আনা যাবে না।

ধারা ৩১

অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ (অলিখিত অংশ)

ধারা ৩২

পরিপূরক অথবা অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন

যখন অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়—

যখন নতুন কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটে

ধারা ৩৩

পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি

পাবলিক অ্যাকাউন্টস সম্পর্কিত নিয়মাবলী (অলিখিত অংশ)

ধারা ৩৪

পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির দায়িত্ব

(১) কমিটি নিশ্চিত হবেন যে, ব্যয় অনুমোদন অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং তা দৃষ্টিগোচরে আনবে।

পরিচালন পদ্ধতি

স্থায়ী আদেশ দ্বারা চালিত হবে।

(১) পর্ষদের অধিবেশন

(১) কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় এবং স্থানেই পর্ষদের অধিবেশন বসতে পারে।

(২) রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা অধিবেশন না ভেঙে কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখতে পারেন।

(৩) রাষ্ট্রপতির নির্দেশিত সময়েই অধিবেশন বসবে।

স্থগিতাদেশের ফলশ্রুতি

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছাড়া স্থগিতাদেশের ফলে সমস্ত জমে থাকা সিদ্ধান্ত অকার্যকর হয়ে পড়বে এবং পরবর্তী অধিবেশনের জন্য নতুন করে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

(১) প্রশ্নাবলী
(২) বিধিপ্রস্তাব
(৩) বিধেয়ক উত্থাপন করা } এই বিষয়গুলি পরবর্তী অধিবেশনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৪) প্রবর সমিতির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে এমন স্থায়ী আদেশের সংশোধনী সংক্রান্ত প্রস্তাব।

পদ্ধতি

(i) প্রশ্নাবলী ঃ প্রশ্নোত্তর এমন ভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

(ii) মুলতুবি প্রস্তাব: এই প্রস্তাব আনার জন্য ৩০জন সদস্য প্রয়োজন।

এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য নির্ধারিত সময় হ'ল বিকেল ৪টা। ৬টা পর্যন্ত বিতর্ক চলবে। এরপরে এই প্রস্তাব সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

(iii) বিধেয়ক

(ক) চারটি পর্যায়

(১) উত্থাপন

(২) প্রথমবার পাঠ

(৩) দ্বিতীয়বার পাঠ

(৪) তৃতীয়বার পাঠ

(১) অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান—বিভাগ - ৪৯

(২) কানাডার সংবিধান—বিভাগ - ১৮

(৩) দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান—বিভাগ - ৫৭

ভারতীয় আইনে এমন কোনো অংশ নেই যেখানে সাংসদদের কোনো বিশেষাধিকার দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় আইনে সাংসদদের শুধু মাত্র দুটি বিশেষাধিকার দেওয়া হয়েছে।

(খ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা

ধারা ৬৭ (৭)

সংসদের উভয়পক্ষর মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। সংসদের উভয় কক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য কিংবা ভোটদানের জন্য কিংবা উভয় কক্ষের পরিচালনের সরকারি রিপোর্টে উল্লিখিত কোনো কিছুর জন্য কোনো সদস্যকেই বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা যাবে না।

বিভাগ ৭২ ডি (৭)

রাষ্ট্রপতির আইন সভায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। এই ধরণের কোনো আইনসভায় বক্তব্য রাখার জন্য কিংবা ভোটদানের জন্য কিংবা এই ধরণের কোনো আইনসভার পরিচালনের সরকারি রিপোর্টে উল্লেখিত কোনো কিছুর জন্য কোনো সদস্যকেই বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা যাবে না।

মতামত প্রদানের এই বিশেষার্ধিকার দুটি বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১) স্থায়ী আদেশ

২) সরকারি রিপোর্ট

ii আটক থেকে অব্যাহতি

ভারতীয় আইনে এই ধরণের কোনো বিশেষাধিকারও দেওয়া হয়নি।

ভারতীয় সংসদীয় আইনে এই বিশেষাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনকে বলা হয়—

আইনসভার সদস্যদের অব্যাহতি সম্পর্কিত আইন ১৯২৫ (নং ২৩, ১৯২৫)

এই আইন অনুযায়ী

(১) ভারতীয় আইন অনুসারে গঠিত আইনসভার সদস্যদের জুরি কিংবা কর নির্ধারক হিসাবে কাজের বাধ্যতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

(২) নিম্নলিখিত অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকেই দেওয়ানি বিধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার কিংবা আটক রাখা যাবে না।

(ক) যদি সেই ব্যক্তি ভারতীয় আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভার সদস্য হন এবং তখন ঐ সভার কোনো অধিবেশন চলতে থাকে।

(খ) যদি এই সভার কোনো কমিটির সদস্য হন এবং সেই সময় এই সভার কোনো অধিবেশন চলতে থাকে।

(গ) যদি সেই ব্যক্তি ভারতীয় আইনসভার যে কোনো কক্ষের সদস্য হন এবং কক্ষের যৌথ সভা চলতে থাকে কিংবা সেই ব্যক্তি যদি যে কোনো কক্ষের জয়েন্ট কমিটির সদস্য হন তাহলে সভার ১৪ দিন আগে কিংবা পরে তাকে আটক কিংবা বন্দী করা যাবে না।

উল্লেখ্য (১) শুধুমাত্র দেওয়ানি বিধি অনুযায়ী আটক থেকে অব্যাহতি

(২) উল্লিখিত সময়ের পরে ঐ ব্যক্তিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

আইনসভার পদ্ধতি

ভারতীয় আইনসভার পদ্ধতি পরিচালিত হয়—

১) পরিচালনের নিয়মাবলী

২) স্থায়ী আদেশ দ্বারা

বিভাগ—৬৭(১) কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্য অনুমোদন নিয়মাবলী

বিভাগ—৬৭(৬) এবং স্থায়ী আদেশ প্রণয়ন

রাষ্ট্রের আইনসভার

বিভাগ—৭২ডি (৬) জন্য অনুমোদন নিয়মাবলী এবং স্থায়ী আদেশ

বিভাগ—৭২ডি (৭) প্রণয়ন

(২) বিধানমণ্ডলীর কোনো নিয়ম কিংবা স্থায়ী আদেশ প্রণয়নের অধিকার নেই।

অধি-রাজ্যগুলির এই অধিকার আছে। ভারতের বিভাগ ১২৯ক দ্বারা এই বিষয়টি পরিচালিত হয়।

পরিষদের গভর্নর জেনারেল-ই এই নিয়ম এবং স্থায়ী আদেশ প্রণয়ন করেন।

স্থায়ী আদেশ এবং নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য

(১) কেন্দ্র কিংবা রাজ্যের আইনসভা নিয়মাবলীর পরিবর্তন কিংবা বাতিল করতে পারে না।

(২) কতগুলি শর্ত সাপেক্ষে স্থায়ী আদেশ সংশোধিত হতে পারে।

নিয়মাবলী এবং স্থায়ী আদেশের বিভিন্ন উদ্দেশ্য

দুটি প্রশ্ন—

(১) আইনসভা কোনো কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারে যদি সেই সব বিষয় তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।

(২) ধরা যাক কোনো একটি বিষয় তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে কিংবা এই বিষয়টি কিভাবে আলোচনা করা হবে? কি ভাবে এটিকে একটি আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে উত্থাপিত করা যাবে? কোন ক্রমানুসারে সদস্যরা তাঁদের বক্তব্য রাখবেন? কোনো সদস্য কি বক্তব্য রাখার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পেতে পারেন? কিভাবে ভোটের সংখ্যা নথিভুক্ত করা হবে? কিভাবে ভোট গননা করা হবে? আর সেই ভোটের মান কিভাবে নির্ণয় করা হবে?

প্রথম প্রশ্নটির সমাধান রয়েছে পরিচালনের নিয়মাবলীর মধ্যে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির সমাধান স্থায়ী আদেশের মধ্যে।

এই আইনটি এইভাবে বলা যায়—

পরিচালন নিয়মাবলী বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করে।

স্থায়ী আদেশ নিয়ন্ত্রিত করে পরিচালন পদ্ধতিকে।

পরিচালনের নিয়মাবলী এবং কাজের স্বাধীনতা

পরিচালনের নিয়মাবলী কি আইনসভার সদস্যদের তাঁদের দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দেয়?

নিয়মাবলী ৮

জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে এবং সেই সদস্যকেই করা যেতে পারে যা সেই সদস্যের বিচারের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।

বিজ্ঞপ্তিদানের সময়

ক) **যে প্রশ্ন মূলতঃ** রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, রাষ্ট্রপতি সেই প্রশ্ন উত্থাপনের সম্মতি নাও দিতে পারেন।

খ) কোনো একটি প্রশ্ন উত্থাপনে রাষ্ট্রপতি সম্মতিপ্রদান করলেও রাজ্যপাল তা উত্থাপিত হতে নাই দিতে পারেন

১) যদি বিষয়টি ভারত এবং বিদেশি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ক্ষুন্ন করে।

ii) **প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার**

নিয়মাবলী ২২-২৩

নিয়মাবলী-২৩

প্রত্যেক প্রস্তাব-ই রাজ্যপালের প্রতি সুনির্দ্দিষ্ট সুপারিশ হিসাবে উত্থাপিত করতে হবে।

বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ

যে সমস্ত বিষয়ে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাবে না, তার সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপিত করা যাবে না।

নিয়মাবলী-২২

প্রস্তাব উপস্থাপনের অধিকারের ওপর এইসব বিবিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও রাজ্যপালের কিছু ক্ষমতা রয়েছে। রাজ্যপাল বিজ্ঞপ্তি জারির সময়ের মধ্যে জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুন্ন করতে পারে কিংবা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে অসন্মতি জ্ঞাপন করতে পারে।

নিষিদ্ধ প্রস্তাব—

নিয়মাবলী - ২৪ক

মূলতুবি প্রস্তাব

নিয়মাবলী ১১-১২

নিয়মাবলী - ১১

জনস্বার্থ বিষয়ক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য পরিষদের পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় বন্ধ রাখতে মূলতুবি প্রস্তাব আনা যায়।

নিয়মাবলী ১২

নিম্নলিখিত বিধি-নিষেধ দ্বারা চালিত

১। কোনো একটি অধিবেশনে কেবলমাত্র একটি এই ধরনের প্রস্তাব আনা যেতে পারে।

২। এই প্রস্তাবে একাধিক বিষয় উত্থাপন করা যাবে না এবং তা সাম্প্রতিক কোনো ঘটনার নির্দ্দিষ্ট বিষয় নিয়েই উত্থাপিত হতে পারে।

৩। ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে এমন কোনো বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না।

৪। আলোচ্যসূচিতে রয়েছে এবং বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এমন কোনো বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না।

১। এই প্রস্তাবে এমন কিছু উত্থাপন করা যাবে না যা নিয়মাবলীর দ্বারা স্বীকৃত।

২। রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন।

৪। অনাস্থা প্রস্তাব

নিয়মাবলী ১২ক

অনাস্থা প্রস্তাবে কোনো মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা কিংবা কোনো মন্ত্রীর নীতির অনাস্থা জ্ঞাপন করা যাবে।

□ □ □

তিন

ভারত-ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য

ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শক এবং ঔক-চি বিজয়। এরা আধুনিক তুর্কমানদের মতো মধ্য এশিয়ার উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত। লিলি নদীর উপত্যকায় প্রথম এদের কথা শোনা যায়। পরে শকেরা ইউ-চি আগমনে দক্ষিণের দিকে সরে যেতে থাকে এবং ১৫০ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে চলে যায়। সেখানে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা রাজত্ব করছিলেন। এই শাসকেরা কিছু সময় পার্থিয়দের অধীনে এবং পরে শতরাপি সামন্ত হয়ে বসবাস করছিল। এটা খুব-ই স্পষ্ট যে তখন পশ্চিম ভারত বিদেশি শাসক শক, ইয়াভানা, এবং পল্লবদের অধীনে চলে গিয়েছিল। এদের সীমান্ত ভাগ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমাগতই পরিবর্তিত হত। এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন শতরাপি। এরা সুরাষ্ট্র ও মূল ভূ-খণ্ডের সংলগ্ন অংশকে ৩৯৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত নিজেদের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিল।

প্রায় ১০০ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে ইউ-চি চীন সীমান্তের পশ্চিম দিক থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং শকদের তাড়িয়ে দিয়ে ব্যাকট্রিয়াতে বসবাস শুরু করে। সেখানে উপজাতিদের প্রধান কদাফিস যিনি কুশান নামে পরিচিত। তারা অন্যদের ওপরে নিজের কতৃত্ব স্থাপন করে। পরে এরা সবাই একত্রীভূত হয়ে যায় এবং উপজাতিদের নামে পরিচিত হয়। কুশান রাজাদের জীবনপঞ্জি ভারত ইতিহাসের বহু বিতর্কিত বিষয়। আর যে সব তারিখগুলির উল্লেখ রইল তাতে বিষদ বিবরণের সুযোগ খুব কম এবং এর সাকিতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। কদাফিস (১৫-৪৫ নিজের রাজ্যকে শক্তিশালী করে দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তার করেন এবং কাবুল ও কাশ্মীর জয় করেন। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা (৪৫-৭৮) খ্রিস্টপূর্বাব্দ পুরো উত্তর পশ্চিম ভারতকে দখলে আনেন। এর মধ্যে উত্তর সিন্ধু, পঞ্জাব এবং সম্ভবত: বারানসীও ছিল। এই সময় ভারত এবং রোমান রাজাদের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। এবং ট্রজানে রাষ্ট্রদূতও পাঠিয়েছিলেন কদাফিস বংশধর রাজা কনিস্ক। প্রথম যুগে অশোকের মতো এই সম্রাটও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পার্থীয়ান ও চিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর সাম্রাজ্য আফগানিস্তান, ব্যাকট্রিয়া,

কানঘর, ইয়াকহ্যান্ড, খোতান এবং কাশ্মীরে বিস্তার লাভ করেছিল। এবং পেশোয়ার ছিল তাঁর রাজধানী। এই সমস্ত রাজ্য পূর্বে গয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তী বংশধর হুবিসকা এবং বাসুদেব (১৪০—১৭৮ খ্রিস্টাপূর্বাব্দ) এখানে রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়ের পরবর্তীকালে আন্ধ্র এবং কুশান রাজত্ব ভেঙে পড়ে যদিও কুশান রাজারা কাবুলে শাসন করেছিলেন। তাঁদের এই পতনের কারণ জানা যায় নি, তবে মনে হয় পারশ্যে সাসানীয়দের অভ্যুত্থানের সঙ্গে এটি সম্পর্কযুক্ত। এক শতাব্দীরও বেশি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অলিখিত ছিল। শক রাজত্বের অধীনে সুরাষ্ট্ররা রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল। তাঁদের সম্পর্ক ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সামান্যই জানতে পারা গেছে।

গুপ্ত রাজত্বের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক হিন্দুধর্মের এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটল। যদিও মৌর্যদের প্রাচীন শহর পাটালিপুত্রের ভাগ্য সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে এঁরা রাজত্ব করে গেছেন। ৩২০ সালে স্থানীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত ১ তাঁর রাজ্যের প্রসার ঘটান এবং গুপ্তযুগের শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর রাজাভিষেক হয়। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত তাঁর বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখলেন ও ৩৪০ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে এসে তিনি তাঁর অভিযান শেষ করেন। এই সময় প্রায় সমস্ত উপদ্বীপ তাঁর অধীনে বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি সমস্ত এলাকাকেই নিজের অধীনে রাখেননি। কিন্তু হুগলি থেকে যমুনা নদী এবং পশ্চিমে চম্বল পর্যন্ত এবং হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য অক্ষুন্ন থাকে। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অথবা বিক্রমাদিত্য মালওয়া, গুজরাট ও কাথিওয়ারাতেও এই বিপুল সাম্রাজ্যের মধ্যে সংযোজন করে এবং গুপ্তরা অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে রাজপুতানা এবং সিন্ধুছাড়া সমস্ত উত্তর ভারতে অক্ষুন্ন শাসন-ব্যবস্থা অটুট রেখেছিল। প্রথমে এঁদের রাজধানী ছিল পাটালিপুত্রতে পরে বসবাস স্থানান্তরিত হয় কৌশম্বী এবং অযোধ্যায়।

হুন, অথবা শ্বেতকায় হুন, যাঁদের একটি শাখা ইউরোপ আক্রমণ করেছিলেন, তাঁদের বর্বর আক্রমণে গুপ্ত যুগের পতন শুরু হল। এই শাখা এশিয়াতেই ছিল এবং উত্তর পারশ্য দখল করে। ওরা ৪৫৫ তে প্রথম ভারত আক্রমণ করে এবং পরাজিত হয়। কিন্তু ৪৯০ সালে দ্বিগুনশক্তি সঞ্চয় করে আবার ফিরে আসে এবং গুপ্তদের সিহাসনচ্যুত করেন। এঁদের রাজারা ছিলেন টরমান এবং মিহিরগুল। ৫৪০ খিস্টাপূর্বাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতের প্রধান কর্তৃত্ব তাঁদের হাতেই ছিল। এঁদের স্থানীয় রাজধানী পঞ্জাবের শিয়ালকোটে ছিল, যদিও তাঁদের কেন্দ্রীয় দফতর ছিল বাসিয়ান ও বালখাতে। মিহিরাগুলার নিষ্ঠুরতা হিন্দুরাজাদের সংঘর্ষে

লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিল। হুনরা ক্রমে উত্তরে বিতারিত হয়েছিল এবং প্রায় ৫৬৫ খ্রিস্টাপূর্বাব্দ পারশ্য এবং তুর্কি এই বিদেশি শক্তিগুলির হানায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যদিও এঁদের কোন স্থায়ী দেশ ছিল না, তবু তাঁদের অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা তঁদের অনেকে উপজাতি হিসাবে যেমন গুরজররা এখানে থেকে গিয়েছিলেন। ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভেঙে গেল, শক ও কুশানরাও এক-ই সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের জনসমষ্টি গড়ে তুলল। এঁদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল রাজপুত গোষ্ঠী।

হুনদের পরাজয়ের পরবর্তী ইতিহাসেও কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে (৬০৬-৬৪৭ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে) প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর যুদ্ধের পর থানেশ্বরের রাজা হর্ষ তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। যদিও তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সময়ের উন্নতি এবং আয়তন গুপ্তযুগের সমতুল্য। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যিনি তাঁর সময় কনৌজের রাজসভায় পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাংলা, অসম এবং উজ্জয়িনীর রাজারা তাঁর সামন্ত ছিলেন। কিন্তু পঞ্জাব, সিন্ধু এবং কাশ্মীর ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র। বাংলার দক্ষিণের রাজ্য ছিল কলিঙ্গ। কলিঙ্গ জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হর্ষ দক্ষিণের চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশিনকে পরাজিত করতে পারেন নি।

এবারে দক্ষিণের ইতিহাসে ফেরা যাক্। কালক্রমানুসারে এবং ঘটনাপঞ্জি অনুসারে দেখলে উত্তরের চেয়ে দক্ষিণের ইতিহাস আরও অস্পষ্ট। দাবিড়দের দেশগুলিকে বর্বর বা বাসযোগ্য নয় ভাবার কোন কারণ নেই। এমনকি, ইউরোপের ক্লাসিক যুগের লেখকেরাও ওদের সম্পর্কে জানতেন। রাজা পানডিয়ন ২০ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে অগাষ্টাসের কাছে একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। প্লিনি সাহারার কথা উল্লেখ করেছেন। টলেমি মাদুরা এবং আরো চল্লিশটির কথাও উল্লেখ করেছেন। জানা যায় মাজিরিসে (Maziris) অগাষ্টাসকে নিবেদন করে একটি মন্দির গড়ে উঠেছিল। এটি ক্র্যাগনোরা নামে পরিচিত। প্রথম যুগে উপদ্বীপের চূড়ান্ত দক্ষিণ দিক পাণ্ডু, শিবা এবং কোলী—এই তিনটি রাজ্য বিভক্ত ছিল। প্রথম দিকে মাদুরা, তিন্নেভেলি জেলার সঙ্গে সংযোগ ছিল। সিরা ও কেরালা ছিল আধুনিক ত্রিবাঙ্কুরের পশ্চিম দ্বীপে অবস্থিত। কোল রাজ্যে ছিল তানজোর, ত্রিচিনপল্লী, মাদ্রাজ এবং মহিশূরের অধিকাংশ অংশ। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম খ্রিস্টাপূর্বাব্দে তে চতুর্থ শক্তি পল্লবরা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর দিক থেকে এসেছিল। তাঁদের রাজধানী ছিল কাঞ্চীপুরমে এবং এই তিনটি রাজ্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ লেগেই থাকত। তাঁদের রাজা নরসিংহ বর্মা (৬২৫-৬৪৫ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে) দাক্ষিণাত্যের বেশ কিছু অংশ শাসন

করেন এবং বেশিরভাগ কোল রাজ্যের পতন হয় ৭৫০রে পরে। কিন্তু কোলরা আরো শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয় এবং রাজা রাও (৯৮৫-১০১৮) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এবং মহিশূর যাঁর রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এয়োবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁদের ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে অন্ধ্ররা দাক্ষিণাত্য শাসন করত ২২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে থেকে ২৩৬ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে পর্যন্ত। কিন্তু পরবর্তী তিনটি শতাব্দীতে বিজাপুরের ভাটাপিতে (বাদামি) চালুক্য রাজ্যের উত্থান পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। এই সময়ের দ্বিতীয় পুলকেশন (৬০৮-৬৪২), যিনি হর্ষের সমকালীন ছিলেন, তিনি সমান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য গুজরাট থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি এতটাই পরাশ্রমশালী ছিলেন যে, তিনি পারশ্যের রাজা দ্বিতীয় খুসরুর সঙ্গে দূত বিনিময়ে করেছিলেন। অজন্তার ফ্রেসকোতে সেই কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরাজিত হন এবং পল্লবরা তাঁকে হত্যা করে।

পুলকেশন এবং হর্ষর মৃত্যুর পর শুরু হল রাজপুত যুগ। ৬৫০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল এর সময়কাল। এই সময় বহু হিন্দু রাজা রাজত্ব করেছেন। এরা মূলতঃ উত্তরের আক্রমনকারী এবং হিন্দু নয় এমন আদিবাসীদের বংশধর। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

১। কনৌজ অথবা পাঞ্চাল। হর্যর মৃত্যুর পর পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। কিন্তু ৮৪০ থেকে ৯১০ খ্রিস্টাব্দে ভোজ (অথবা মিহির) এবং তার পুত্র বিহার থেকে সিন্ধু পর্যন্ত উত্তর ভারতে সর্বোচ্চ শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে গাহরওয়ার শাসনকাল গুরুত্ব লাভ করে।

২। কনৌজের সঙ্গে বাংলার পালদের প্রায়-ই যুদ্ধ লেগে থাকত। ৭৩০ খ্রিস্টাব্দেতে এই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজারা রাজত্ব করতেন। ধর্মপাল (৬০০ খ্রিস্টাব্দে) কনৌজের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। ক্রমে পাল রাজত্বের পূর্ব দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য সেনদের থেকে পৃথক হয়ে গেল।

৩। ঝুমনার দক্ষিণের জেলা জিজ্যাকেভুক্তি (Jejakabhuekti) নামে পরিচিত ছিল এবং সেডি চ্যান্ডেল এবং কালাকুড়ি নামে দুটি রাজ্যের দ্বারা শাসিত হত। চ্যান্ডেলরা গণ্ড বংশদ্ভুত বলে মনে করা হচ্ছে। এঁরা স্থাপত্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রেখেছে। খানুরাও মন্দির এঁদের নির্মিত। কীর্তিবর্মন চ্যান্ডেল (১০৪৯-১১০০) নিজের এলাকার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন এবং রূপকধর্মী

নাচক প্রভোদাকান্ড্রদয়া (Probodhacandrodaya) তাঁর সভায় অভিনীত হয়েছিল।

৪। মলিওয়ার পরমার রাজ্য সমানুপাতিকভাবে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিল। রাজা মুনজা (৯৭৪-৯৯৫) এবং ভোজ লেখকও ছিলেন আবার সার্থক যোদ্ধাও ছিলেন।

শক যুগ

ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, প্রথমে ৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধরে মূলত ১২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শক যুগের সূত্রপাত হয়। কনিষ্কই এই যুগের প্রথম রাজা।

ঠিক কিভাবে কুশান রাজারা এখানে শাসন করেন, তার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। এটা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে ,প্রথম কদফিস্ (কুজুল কদফিস্) এবং দ্বিতীয় (কদফিসের) পরে কনিষ্ক ক্ষমতায় আসেন। ড. স্মিথের মতে এই দু'জনেরও আগে ব্যাকট্রিনাইজড্ সীদিয়ান ৪০ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি গান্ধার এবং গন্ডফারেসদের কাছ থেকে তক্ষশিলা রাজ্য অধিগ্রহণ করে নেন। পার্থিয়ান রাজা ধর্মপ্রচারের কাজে নিজকে নিয়োজিত করে সেন্ট টমাস উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁর ছেলে ভীম (৭৮-১১০) পঞ্জাব এবং অর্ধেক গঙ্গা উপত্যাকার পুরোপুরি পশ্চিম প্রান্ত নিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

কদাফিস এবং কনিষ্কর মধ্যে প্রায় দশ বছরের ব্যবধান ছিল। কনিষ্ক একজন ভাজেস্কার পুত্র ছিলেন। পূর্বসূরীদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি ব্যাকট্রিয়া থেকে নয়, খোতান থেকে এসেছিলেন এবং পারপানের কাপিসিতে তিনি তার গ্রীষ্ম কাটান। শীত কাটান পুরুষপুরে (পেশোয়ার)। তাঁর সাম্রাজ্যের কক্ষপথ গ্রেকো-ইরান দেশের মধ্য পথে।

কনিষ্ক সাম্রাজ্য বেশি দীর্ঘ হয়নি। তাঁর দুই পুত্র বশিস্ক ও হুবিস্ক এর পরবর্তীকালে রাজত্ব করেন।

তৃতীয় শতাব্দীতে কুশানদের শক্তি ব্যাকট্রিয়া, কাবুল এবং গান্ধারে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তাঁরা সাসানিদের কবলে দিন কাটান।

ক্ষত্রিয় অথবা প্রাদেশিক শাসক: শকেরা ছিলেন তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসক। ক্ষাত্রপ বা সাত্রপ এই ইরানি উপাধি দুটি বহু রাজত্ব ধরে এঁরা বহন করে এসেছেন। ঔক চি'র আক্রমণে শকেরা দেশ ছাড়া হয়।

১। ক্ষাত্রপরা সুরাষ্ট্রে (কাথেওয়ার) এসে বসবাস করেন। এঁদের একজন রাজা চসথানা কুশানদের আগে মালওয়াতে থেকে যায় এবং কনিষ্কর সামন্ত

হিসাবে দিন কাটায়। তিনি উজ্জয়িনী শাসন করেন। এই উজ্জয়িনী ভারত সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

২। খাহারাতাদের সঙ্গে বংশ পরম্পরায় আন্ত্রদের শত্রুতা ছিল। এঁরা আধুনিক সুরাট এবং বোম্বাইয়ের মাঝামাঝি দেশ মহারাষ্ট্রকে শাসন করত। এটিই পরে শক রাজ্য হয়। শতকর্মীদের দ্বারা পরে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উজ্জয়িনীয় প্রাদেশিক রাজা রুদ্রমান যখন আন্ধ্র রাজাকে জয় করেন, তখন পূর্ব ও পশ্চিমের রাজ্যগুলির মধ্যে ক্রমাগত বিরোধ আদর্শগত বিভেদকে তীব্রতর করে তুলেছিল। শকরা, ভারতের স্কিথিয়ান অথবা সিরিনডিয়া, থরকানদের মতো বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আসক্ত হল। এদিকে আন্ত্ররা ব্রাহ্মান্যধর্মের সমর্থক ছিল।

গুপ্ত

তৃতীয় শতাব্দীর ঘটনাগুলি ইতিহাসে লেখা নেই। কুশান সাম্রাজ্য সম্পর্কে আমরা খুব কম তথ্যই জানি।

৩১৮ থেকে ১৯, যখন পুরোনো মগধ শহরে গুপ্ত যুগের অভ্যুদয় হল তখন নতুন আলোর সূচনা হল।

গুপ্তরা, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মলভাস গুজরাট এবং সুরাষ্ট্র জয় করলেন। উজ্জয়িনীর শক রাজত্বের প্রথম সাতরাপকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। পশ্চিমে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার থাকাতে তিনি পাটলিপুত্রের বদলে অযোধ্যা এবং কৌশম্বীতে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রায় ১৫৫ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে তিনি সিন্ধু এবং কাথিওয়ারের নিম্নাংশের সবটাই জয় করেছিলেন।

পুশিয়ামিত্র তাঁকে বারবার পরাজিত করেছিলেন। ব্যাকট্রিয়ানা একেবারে উত্তরে থাকাতে পারথিয়া ও ভারতের মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল। সুতরাং পার্থিয়া থেকে ভারতকে আক্রমণের সুযোগ কম ছিল। বলাবাহুল্য একজন পার্থিয়া শাসক মিথ্রডাটেস (১৭০-১৩৪) কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় ১৩৮ খ্রিস্টাব্দে তক্ষশিলাকে নিজের দেশের সঙ্গে যুক্ত করেন।

পার্থিয়া এবং ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতার অবসান

উপজাতি আন্দোলনের ফলে পার্থিয়া (পার্থব) ও ব্যাকট্রিয়াকে যে নতুন আক্রমণের মুখাপেক্ষী হতে হয়, তাতেই তাঁদের স্বাধীনতার অবসান ঘটে। এই উপজাতি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল ভারত থেকে অনেক দূরে মঙ্গোলিয়ার প্রান্তদেশে।

প্রায় ১৭০ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে স্কিথিয়ান যাযাবর সম্প্রদায়, ঔক-চি অথবা টোখারিয়ান সম্প্রদায়, হুন বা হিয়ান নুর দ্বারা গোবি থেকে বিতাড়িত হয়ে, ব্যাপকভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। ফলে এশিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

তারা শকদের কবলে পড়ে। শকেরা পার্থিয়ার উত্তরে যে সব স্কিথিয়ানরা বসবাস করত, তাদেরকে ইরান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে এবং জাজারটেসের (Jazartes) গোচারণভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। বিতাড়িত শকেরা পার্থিয়া এবং ব্যাকট্রিয়ানাকে আক্রমণ করল এবং ১৪০ থেকে ১২০ খ্রিস্টাপূর্বাব্দের মধ্যে গ্রীক শাসনের শেষ পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দিল। এরপর টোখারিয়ানরা, পালাক্রমে উ-সুন উপজাতির দ্বারা পরাজিত হয়ে অক্সাসে গিয়ে বসবাস শুরু করে এবং এরপরে ভারতের প্রবেশ মুখে পশ্চিম ইরানে শকদের রাজ্যগুলি নিয়ে নেয়। খ্রিস্ট জন্মের পরে প্রথম শতাব্দীতে এই প্রবেশ পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

ভারত জয় করে কুশানরা উ-টি উপজাতিদের একত্র করে পার্থিয় শক প্রজাতি এবং পঞ্জাবের লোকদের ওপরে তাঁদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

এদের আসল রাজা কনিষ্ক কবে সিংহাসন আরোহন করেন, তার সঠিক তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে মনে হয় ৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং খ্রিস্টাব্দের ২০০-র মাঝামাঝি।

তৃতীয় অ্যানিটওকস্ (২৬১-২৪৬ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে সেলুসিত সাম্রাজ্য শাসন করতেন এবং পার্থিয়া ও ব্যাকট্রিয়ানা এই দুটি প্রদেশ জয় করেন। পরে অবশ্য এঁরা স্বাধীন হয়ে যায়। পার্থিয়াদের ভারতীয়রা পাল ভাস আখ্যা দিয়েছিলো। এরা তুর্কম্যান যাযাবর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং কাস্পিয়নের দক্ষিণ-পূর্ব রাজ্য দখল করেছিল। ব্যাকট্রিয়ানরা উত্তরপূর্ব পার্থিয়াদের সীমান্তবর্তী ছিল। এবং হিন্দুকুশ এবং অক্সাস এর মাঝামাঝি এসে বসবাস করে। তাদের শহরের সংখ্যা এবং সম্পত্তি লোককাহিনী হয়ে রয়েছে। এরা দুজনেই অ্যান্টিওকসের সমস্যার এবং তার বংশধর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেলুকসের পশ্চিমে পলায়নের সুযোগটা নিয়েছিল বলে মনে হয়।

আরসাসেসের নেতৃত্ব পার্থিয় বিদ্রোহ খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। ইনি এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং এঁরা প্রায় ৫০০ বছৰ ধরে পারশ্য শাসন করেন।

ব্যাকট্রিয়ানদের উত্থানের কারণ ছিল গ্রীক সাতরাপের উচ্চাশা। এশিয়ার মর্মদেশে গ্রীক সংস্কৃতির আমদানি করেছিলেন ভায়োতোটোস।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই সে ভারত-ইরান সীমান্তে এইসব দুঃসাহসী জাতিগুলির অভ্যুত্থানের ফলেই অশোকের বংশধরদের অবলুপ্তি ঘটে।

পঞ্জাবে এক সময় পারশ্যের প্রাদেশিক শাসকরা শাসন করত। পরে এটি আলেকজান্ডারের অধীনে যায়। এরপরে আরো ছোট ছোট শক্তি একে আক্রমন করে। প্রথম এবং দ্বিতীয় ডায়োতোটোমের পরে ব্যাকট্রিয়ার রাজা ছিলেন ইউথিডিমেস। তিনি সিরিয়ার অধীশ্বর অ্যাটিওবেসের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রায় ২০৮এ ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা লাভের পরে শান্তি স্থাপিত হয়। এই রকম শত্রুতা থাকাকালীন সিরিয়ার সৈন্যরা হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে কাবুলে প্রবেশ করে ও সেখানকার শাসক শুভগাসেমাকে পরাস্ত করে। অ্যানথিডিমোসের ছেলে দেমিক্রিয়াস বর্তমান আফগানিস্তানে নয়, মূল ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন এবং ভারতীয় রাজাদের উপাধ গ্রহণ করেন (২০০-১৯০)। ১১০ থেকে ১৮০র মধ্যে ব্যালিয়ন এবং আগাথোক্লিস নামে তক্ষশিলাতে গ্রীক অভিযানকারীরা বসবাস করতেন। ১৯০ থেকে ১৪০ এর মধ্যে গ্রীসের মিলান্ডা অথবা সিনাডার কাবুল এবং পঞ্জাব দখল করেন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৩)

হুন

কুমারগুপ্তর শেষের বছরগুলিতে নতুন ইরান সম্প্রদায় সাম্রাজ্য আক্রমণ করে কিন্তু সীমান্তবর্তীদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে সরে যায়। কিন্তু স্কন্দগুপ্তর সময়ে প্রথম যে মারাত্মক ধরনের বহিঃ আক্রমণ হয়, তারাই হুন নামে পরিচিত। এই হুনদের মধ্যে মঙ্গোলিয়ান সম্প্রদায় ও ছিল। এরা ইউরোপও আক্রমন করেছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি যে-সব শ্বেতকায় হুন বা ইপথালিটস্রা ভারতে আগমন করেছিল, তাদের সঙ্গে আত্তিলার গুপ্ত অনুসরণকারীদের চেয়ে তুর্কিদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। অক্সাস উপত্যাকায় কিছুদিন অবস্থানের পরে তারা পারশ্য এবং কাবুল দখল করে। কয়েকবছরের মধ্যেই স্কন্দগুপ্ত তাদেরকে তাড়িয়ে দেয় (৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। কিন্তু এরপরে তারা ৪৮৪তে ফিরোজ দ্য সাসানিদকে হত্যা করে এবং কোনো ভারতীয় তাদের দমন করতে পারেনি। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল তোরামান। তিনি নিজেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দে মালবদের

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর পুত্র মিহিরগুল সাকল-এ (শিয়ালকোট) রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিল।

স্থানীয় রাজকুমার যশোবর্মন মিহিরগুলকে বিতাড়িত করেন। হুনরা সব জায়গা থেকে পুরোপুরি বিতাড়িত হয়নি। অনেকে সিন্ধু উপত্যকায় বসবাস শুরু করে।

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে থানেশ্বরে, নতুন দিল্লির কাছে নতুন একটি শক্তির অভ্যুদয় হয়। দুঃসাহসিক রাজা প্রভাকরবর্ধন একটি শক্তি সংগঠিত করে গুজর, মালওয়া এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাজকুমারদের তাঁর শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেন। এর কিছুদিন পরে ৬০৪ অথবা ৬০৫এ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলার গৌরের রাজার আদেশে খুন হন। সুতরাং তাঁর ছোট ভাই হর্ষর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

মনু এবং শূদ্র

পাঠকেরা জানেন যে, মনু প্রণিত বিধান অনুযায়ী সমাজ মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত দিল। চাতুবর্ণের অন্তর্গত একটি বিভাগ ও চাতুবর্ণের বর্হিগত আরেকটি বিভাগ। পাঠকেরা এও জানেন, চাতুবর্ণের বাইরে যারা ছিলেন, তাদের-ই অস্পৃশ্য বলা হত। যারা চাতুবর্ণের অন্তর্গত ছিল, তাদের সঙ্গে এই অস্পৃশ্যদের বিরোধ ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারটি শ্রেণী নিয়ে এটি একটি যৌগিক প্রতিষ্ঠান। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে গোষ্ঠীর ভাবনা থেকে শ্রেণীর ভাবনাকে বেশি মূল্য দেওয়া হয় এবং এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য ঘটায়। ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিবাদ তৈরি হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এদের কারও অবস্থা সমান্তরাল স্তরে নয়, লম্বালম্বি অর্থাৎ একজন আর একজনের ওপরে। কোনো হিন্দু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। প্রত্যেক ভারতবাসী এটি জানে। যদি কোনও ব্যক্তি এই ঘটনা না জানে, তবে ধরে নিতে হবে তিনি বিদেশি। একজন বিদেশির মনেও যদি কোনরকম জিজ্ঞাসা থাকে, তবে তিনি মনু প্রণিত বিধান পড়লে তার এই সংশয় কেটে যাবে। মনু এই হিন্দু সমাজের প্রবক্তা। তাঁর বিধানকে ভিত্তি করেই এই সমাজ গড়ে উঠেছে। তাঁর স্বার্থেই মনুস্মৃতি থেকে আমি এটি উপস্থাপিত করছি। এর মধ্যে দিয়ে হিন্দু সমাজের অসাম্যের নীতিই প্রতিফলিত হবে।

এই নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে যে, মনুর স্মৃতিতে যে অসাম্যের কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য তো ঐতিহাসিক ঘটনায় সীমাবদ্ধ। এটি অতীত ইতিহাস,

বর্তমানে হিন্দুরা তা পালন করেন না। আমি নিশ্চিত, এর চেয়ে বড় ভুল আর কিছু নেই। মনু অতীত ইতিহাস নয়। অতীতের চেয়েও বর্তমান আরো সত্য। এটি 'জীবন্ত অতীত'। তাই এটি বর্তমান। এর চেয়ে বর্তমান সত্য আর কিছু হতে পারে না।

মনু যে অসাম্যের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে ভূমির আইনের ক্ষেত্রে বলবৎ হত, এই কথা বিদেশিদের জানার কথা নয়। কয়েকটি ঘটনা দিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে।

মারাঠা এবং পেশোয়ারের নিয়ম অনুসারে, পেশোয়ারের রাজধানী পুনা শহরে বিকেল ৩টে এবং সকাল ৯টা-এর মধ্যে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কেননা সকাল ৯টা এবং তিনটের পরে, তাদের ছায়া দীর্ঘায়ত্ত হত। এবং সেই ছায়া যদি ব্রাহ্মণদের ওপরে এসে পড়ত তাহলে তারা অপবিত্র হয়ে যেত। এই অবস্থায় তারা খাদ্য এবং জল স্পর্শ করতে পারত না। যতক্ষন না স্নান করে পবিত্র হতে পারত, ততক্ষণ তাদের মুক্তি ছিল না। সেইজন্য খেরা শহরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। গরু, কুকুর ঢুকতে পারত, কিন্তু অস্পৃশ্যরা পারত না। (১)

মারাঠা এবং পেশোয়ারের নিয়ম অনুসারে একজন অস্পৃশ্য মাটিতে থুতু ফেলতে পারত না। পাছে কোন ব্রাহ্মণ যদি তা পাড়িয়ে দেয়, তাই তাকে মাটির একটি হাঁড়ি গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। তাকে নিজের পায়ের চিহ্ন মুছে দেবার জন্য একটা কাঁটাঝোপ গাছ বয়ে বেড়াতে হত। যদি কোন ব্রাহ্মণ সামনে এসে পড়ত, তক্ষুনি তাকে দূরত্ব রেখে শুয়ে পড়ত হত। পাছে ব্রাহ্মণের গায়ে যদি তার ছায়া পড়ে। (২)

মহারাষ্ট্রে একজন অস্পৃশ্যকে যাতে দ্রুত চেনা যায়, তারজন্য তার গলায় কিংবা হাতের কবজিতে একটি কালো সুতো বেঁধে রাখতে হত।

গুজরাটে অস্পৃশ্যদের চিহ্নিত করণের জন্য খুঁড় বেঁধে রাখতে হত। (৩)

পঞ্জাবে একজন ঝাড়ুদারকে শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হলে অবশ্যই একটি ঝাঁটা বয়ে বেড়াতে হত। (৪)

১. গ্রেট রিলিজয়নস্ অব্ ইন্ডিয়া : ড. মুয়্যে মিচেল, পৃ : ৬৩
২. বোম্বাই গেজেটিয়ার, খণ্ড-১২, পৃ: ১৭৫
৩. এনসাইক্লোপেডিয়া, আর অ্যান্ড ই, খণ্ড-৯, পৃ: ৬৩৬
৪. পঞ্জাব সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯১১, পৃ: ৪১৩

বোম্বাইতে একজন অস্পৃশ্যকে পরিস্কার এবং ছেঁড়া নয় এমন পোশাক পড়তে অনুমতি দেওয়া হত না। দোকানদাররা এ ব্যাপারে সচেতন ছিল। একজন অস্পৃশ্যকে পোশাক বিক্রির সময় তারা দেখে নিত সেটি যেন ছেঁড়া এবং কর্দমাক্ত থাকে।

মালাবারে অস্পৃশ্যরা একতলার বেশি উঁচু বাড়ি নির্মাণ করতে পারত না। এবং মৃত্যুর পরে দেহ দাহ করতে পারত না।

মালাবারে অস্পৃশ্যরা ছাতা বহন করতে পারত না, জুতো, সোনার গহনা, পড়তে পারত না। দুধ দোয়ানো নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি দেশের চালু ভাষা প্রয়োগ করতে পারত না।

দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যদের কোমরের ওপরের অংশ অনাবৃত রাখা ঘোরতর নিষিদ্ধ। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে অনাবৃত রাখা বাধ্যতামূলক ছিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জাত বিচার এত তীব্র ছিল যে, সেখানকার স্বর্ণকারদের ভাঁজ করা ধুতি পড়তে দেওয়া হত না এবং অভিবাদন জানানোর সময় 'নমস্কার' এই কথাটি প্রয়োগ করতে পারত না।

মারাঠা আইন অনুসারে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে তার জিব কেটে নেওয়া হত। বস্তুত: পেশোয়ার আইনে বেশ কয়েকজন স্বর্ণকারের আইন ভঙ্গ করে বেদ মন্ত্র উচ্চারণের জন্য জিব কেটে নেওয়া হয়েছিল।

নিম্নোক্ত চিঠির মধ্য দিয়ে মনু প্রণিত ধর্ম, ভূমি সংক্রান্ত আইনে সীমাবদ্ধ ছিল কি ছিল না তার ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

দামুলসেট ট্রিমবাকসেটের প্রতি,

পর্ষদের মান্যবরেষু সভাপতি স্বর্ণকারদের নমস্কার, এই শব্দের মাধ্যমে অভিবাদন জানানোর পদ্ধতিতে নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে যথার্থ কাজ করেছেন। সকলকেই এই নিয়ম জানিয়ে দিন এবং এই নিয়ম কঠোরতার সঙ্গে পালিত হচ্ছে কিনা তাও সযত্নে লক্ষ্য রাখা উচিত।

বোম্বাই কাস্‌ল
৯ই আগস্ট ১৭৭৯

আদেশানুসারে
স্বাক্ষর : ডব্লু পেজ
সরকারের সচিব

(২)

সরকারি প্রস্তাব

২৮শে জুলাই ১৭৭৯

"স্বর্ণকারেরা নমস্কার কথাটা ব্যবহার করার ফলে ব্রাহ্মণ ও স্বর্ণকারদের মধ্যে প্রায়-ই বিবাদ লেগে থাকত। কেননা ব্রাহ্মণরা মনে করত, এ ব্যাপারে স্বর্ণকারদের কোনও অধিকার নেই। স্বর্ণকারেরা এই ধরণের আচরণের মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। ব্রাহ্মণরা আমাদের কাছে বারবার অভিযোগ করেছে। পেশোয়ারাও রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ জানিয়েছে, স্বর্ণকারের এই ধরণের আচরণ করতে নিষিদ্ধ করা হোক। ব্রাহ্মণদের এই অভিযোগের যথার্থতা আছে। স্বর্ণকারদের নমস্কার করতে নিষেধ করলে এই বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটবে। এই ব্যাপারে কোম্পানির কোনও স্বার্থ নেই। আমরা অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।" সারা ভারতবর্ষ জুড়েই ব্রাহ্মণদের গুরু দণ্ড থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এমনকি খুন করলেও তাদের ফাঁসি দেওয়া হত না।

পেশোয়ায় জাত অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি ধার্য হত। কঠোর পরিশ্রম এবং মৃত্যু অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত।

পেশোয়ায় ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের মালের জন্য কিছু কিছু কর থেকে রেহাই দেওয়া হত। এবং তারা যে শস্য আমদানি করত, তারজন্য কোনরকম ফেরি ভাড়া লাগত না। ব্রাহ্মণ জমিদারদের অন্য শ্রেণী থেকে কম শুল্ক দিতে হত। বাংলায় জাত অনুযায়ী জমির খাজনা ধার্য হত। অস্পৃশ্য প্রজাদের উচ্চহারে খাজনা দিতে হত।

এই সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে মনু যদিও খ্রিস্টের পূর্বে বা কিছু পরে কিন্তু আজও তিনি মৃত নন। যখন কোন হিন্দু রাজা শাসন করতেন, তখন হিন্দু এবং হিন্দুর মধ্যে অস্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্যর মধ্যেই মনুর আইন অনুযায়ী বিচার প্রয়োগ করা হত। এবং এই আইন মূলতঃ অসাম্যকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠত।

(৩)

মনু এই ধর্মের প্রবক্তা। একে বলা হয় মানব ধর্ম। এর অর্থ, এই ধর্মের মাধ্যমে সর্বকালে সব মানুষের মঙ্গল সাধিত হবে। এটা আশীর্বাদ না অভিশাপ এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের চেষ্টা আমি অব্যাহত রাখব। কিন্তু ভারতের বাইরে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই মানব ধর্ম এমন একটি তত্ত্বের ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে, ব্রাহ্মণরা সমাজের সব রকম সুবিধা পাচ্ছে

আর শূদ্ররা এমন কি মানবিক অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। ব্রাহ্মণরা উচ্চ বংশে জন্ম বলে সব কিছুর উর্ধ্বে, আর শূদ্ররা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এইসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সবকিছুর নিচে অবস্থান করছে।

মানব ধর্মের নামে এত বড় নির্লজ্জতা এবং উদ্ভট আর কিছু হতে পারে না। ড. আর, পি, পরঞ্জাপে, একজন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ্ এবং সমাজ সংস্কারক। তাঁর চেষ্টার কথা উল্লেখ করতে আমি এতটুকু দ্বিধান্বিত হব না।

ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত

এই বিষয়টি যারা ব্রাহ্মণ নয়, তাদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল। এই অব্রাহ্মণ দল বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এবং মধ্য প্রদেশগুলিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এরা মূলতঃ একটি বিশেষ গোষ্ঠী দেশের চাকরিতে একচেটিয়া না হতে পারে তার জন্য গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণরা ভারতের সব অঞ্চলের এবং সব দফতরের সরকারি চাকরিতে একচেটিয়া সুযোগ ভোগ করছিল। এই অব্রাহ্মণ দলগুলি এমন একটি নীতি প্রণয়ন করল, যেটি প্রাদেশিক অনুপাত নীতি নামে পরিচিত। এতে বলা হল যে, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের সময় ব্রাহ্মণ প্রার্থীর সঙ্গে সঙ্গে নূন্যতম যোগ্যতাসম্পন্ন অব্রাহ্মণ প্রার্থীদেরও সুযোগ দেওয়া হোক। আমার মতে, এই নীতির মধ্যে কোন ভুল নেই। বরং এটিই অন্যায় যে, দেশের শাসন-ব্যবস্থা, যত চালাকই হোক না কেন একটি গোষ্ঠীর হাতে সমর্পিত হওয়া উচিত নয়।

অব্রাহ্মণ দল এই মত পোষণ করত যে, যোগ্য সরকারের থেকে ভালো সরকার আরো জরুরি। এবং এটি সংসদ এবং বিচার বিভাগেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শাসনতন্ত্রেও এটি প্রয়োগ করতে হবে। শাসনযন্ত্রের মাধ্যমেই সোজাসুজি জনগণের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো যায়। যদি সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়, তবে কোনও শাসন-ব্যবস্থাই ভালো হতে পারে না। একমাত্র ব্রাহ্মণদের হাতে শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হলে সেই শাসন-ব্যবস্থা সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারে না। ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, অন্যদের নীচু জাত বলে ঘৃণার চোখে দেখে। শূদ্ররা তাদের চাহিদার উপযোগী নয়। জনগণ সম্পর্কে যাদের অনীহা রয়েছে, যারা অনায়াসে দুর্নীতি করতে পারে। কি করে তারা ভালো প্রশাসক হতে পারবে? ভারতীয় জনগণের কাছে তারা বিদেশিদের মতোই বহিরাগত বলা যায়। এর বিরোধিতা করে ব্রাহ্মণেরা দক্ষতার প্রশ্ন তুলে নিজেদের যুক্তিগ্রাহ্যতা দাবি করেছে। তারা তুরূপের তাস, এটি দিয়েই তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের

সুযোগ আদায় করবে। যদি যোগ্যতাই বিচার্য বিষয় হয়, তাহলে অন্যান্য বিষয়ে সরকারি চাকরিতে তাদের খুব কম সুযোগই রয়েছে। যদি যোগ্যতাই একমাত্র বিচার্য বিষয় হয় তবে ব্রাহ্মণদের পরিবর্তে ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন, তুর্কিদের নিয়োগ করলেই হয়। অব্রাহ্মণ দল এই ধরনের যোগ্যতাকে পুজো করার তীব্র প্রতিবাদ করে এবং ভালো শাসন-ব্যবস্থা চালু করার জন্য সমস্ত জাতের মানুষকে সরকারি চাকরিতে সুযোগ দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এই নীতি মানবতার জন্য অব্রাহ্মণ দলের আর্দশ। ব্রাহ্মণরা যখন ক্ষমতায় তখন ব্রাহ্মণ চালিত প্রশাসনকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য এবং সরকারি চাকরিতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য ন্যূনতম দক্ষতার শাসন চালু করতে চাইছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জনস্বার্থে তাদের প্রণীত নীতি নিন্দনীয়।

এই নীতি নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণদের ক্রোধান্বিত করেছিল। তাদের দাঁতে দাঁতে পিষ্ঠন করা ছাড়া উপায় ছিল না। ড. পরঞ্জাপের এই লেখাটিতে অব্রাহ্মণ দলের নীতির প্রতি চরম কটাক্ষ করা হয়েছিল। অব্রাহ্মণ দলকে এমনভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল যে, একে অনুকরণ করা মুস্কিল ছিল। এখন যখন প্রকাশ পেল, আমি জানি অনেক অব্রাহ্মণ নেতা শুধু রেগেই যান নি, বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিলেন। আমার পরঞ্জাপের বিরুদ্ধে একটিই নালিশ : তিনি এর কৌতুকটা বুঝতে পারেননি। অব্রাহ্মণেরা নতুন কিছু করেনি। এরা মনুস্মৃতিকে পুরো উল্‌টিয়ে দিয়েছে। এক কথায় টেবিল উল্টিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ মনু শূদ্রদের যে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরাও ব্রাহ্মণদের সেই জায়গায় নিয়ে এসেছে। মনু যেহেতু ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি তাই ব্রাহ্মণদের সবরকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। শূদ্রদের যে অধিকার প্রাপ্য ছিল, মনু তাদেরকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। একজন শূদ্র যদি এবার শূদ্রদের বেশি সুবিধা দেয়, তারজন্য কি বিভোক্ষের কোনও কারণ আছে? এই কথা শুনতে উদ্ভট লাগতে পারে। কিন্তু মনুই এর উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কে এখন অব্রাহ্মণদের গালি দেবে? ব্রাহ্মণেরা পারে, কেননা তাদের কোনো পাপ নেই কিন্তু মনুস্মৃতির পূজারকরা কি দাবি করতে পারেন যে, তাদের কোনো পাপ নেই। ড. পরঞ্জাপের লেখায় মানব ধর্মে এই যে আসাম্য রয়েছে তারই নিন্দা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণদের শূদ্রদের জায়গায় রেখে তাদের কেমন অনুভূতি হয় সেটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

এই অসাম্য শুধু হিন্দুদের মধ্যে আটকে থাকে নি। সর্বত্রই এটি বিরাজ করছে। এই অসাম্যের ফলে সমাজ উঁচু, নীচু, মানব এবং গোলাম শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেছে।

অংশ ৩

পাঁচ

সামাজিক ব্যবস্থায় সংরক্ষণ

[এগুলি ড. আম্বেদকরের হাতে লেখা চারটি পাতা থেকে সংগৃহীত। মূলরচনা থেকে এগুলি বেরিয়ে এসেছে। প্রথম পাতার নম্বর-ই ছিল ছাপান্ন। অর্থাৎ প্রথম দিকের পাতাগুলি পাওয়া যায়নি। পরবর্তী অংশগুলিও পাওয়া যায় নি।]

* * * * * * * * * * * * * * *

XII. ১০০ ।। যে ব্যক্তি বেদ শাস্ত্র বুঝতে পারবে, তারই কেবল সমস্ত দেশের ওপরে সর্বময় ক্ষমতা থাকবে। সৈন্যদের আদেশ দেওয়া, রাজ্যের কর্তৃত্ব ও শাস্তদানের ক্ষমতার অধিকারী হবে।

প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং একে চালু রাখার জন্য যে দ্বিতীয় কৌশলটির কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে প্রথমটির পার্থক্য রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থায় কতগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে একি গঠিত।

চূড়ান্ত আক্রমণের হাত থেকে সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করার ব্যাপারে তিনটি শর্ত মনে রাখা প্রয়োজন। তিনটি কারণে বিপ্লব সংগঠিত হয়। ১। কোনো কিছু মিথ্যে এই বোধের অস্তিত্ব (২) যখন বুঝতে পারে, কেউ মিথ্যে কারণে শাস্তি পাচ্ছে ৩। এবং অস্ত্র পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। দ্বিতীয় শর্ত হল, বিদ্রোহীদের সঙ্গে দুটি উপায়ে কথা বলতে হবে। একটি উপায় হল, বিদ্রোহ যাতে না হয় তার জন্য বাধা দিতে হবে। দ্বিতীয় উপায় হল, এটি ভেঙ্গে যাবার পর তাকে দাবিয়ে দিতে হবে। তৃতীয় শর্ত হল, বিপ্লবকে বাধা দেওয়া সম্ভব কিনা এবং তাদেরকে দাবিকে রাখা সম্ভব কিনা, তা নির্ভর করছে বিদ্রোহীদের উপরিউক্ত তিনটি শর্তের উপরে।

কোন সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে বেড়ে উঠতে বাধা দেয়, শিক্ষা গ্রহণে বাধা দেয়, অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধা দেয়, অর্থাৎ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে বাধা দেয়। আবার অন্য দিকে যে সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে বেড়ে উঠবার সুযোগ দেয়, শিক্ষার সুযোগ দেয়, যারা অন্যায়ভাবে নিপীড়িত হচ্ছে তারা যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাদেরকে বাধা দিতে পারে না। হিংসা শক্তি প্রয়োগে বিদ্রোহ দমন

করে সমাজ-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছে। তারা সমাজের নীচু শ্রেণীর জন্য সামাজিক মর্যাদা বংশপরম্পরায় স্থির করে দিয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক মর্যাদাও স্থির করে দিয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক মর্যাদাও স্থির করে দিয়েছে। দু'য়ের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই। সুতরাং বিক্ষোভের কোন সম্ভাবনা নেই। যারা নীচু শ্রেণী, তাদের শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং এই ব্যাপারে কেউ সচেতন নয় যে তাদের এই দৈন্য পরিস্থিতির জন্য বিক্ষোভের কোন প্রয়োজন রয়েছে। যদি কেউ সচেতন হয়েও থাকে, কিন্তু এরজন্য কাউকে দায়ী করতে পারে না। কারণ সে জানে, সব-ই ভাগ্যের পরিহাস। যদি কারও মনে অসন্তোষ থাকে। যদি বিক্ষোভের জন্য তার মনে সচেতনতা দেখা দেয়, তবুও হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার উপায় নেই, কেননা হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা জনগণের অস্ত্র ধারণের অধিকারকে অস্বীকার করে। যে সমাজ-ব্যবস্থা এইসবের ব্যবহারকে স্বীকার করে, তারা ভিন্নপথে চলে। তারা সকলের সমতার কথা ভাবে। তারা সকলের দান আহরণের অধিকারকে অনুমোদন করে, তারা অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেয়, তারা বিদ্রোহীদের গায়ের জোরে দমন করাকে ঘৃণ্য মনে করে। সুযোগের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা, জ্ঞান অর্জনের অধিকার খর্ব করা, অস্ত্র ধারনের অধিকারকে অস্বীকার করা, অত্যন্ত নিষ্ঠুরতম অন্যায়। এর ফলাফল............... এবং মানুষ। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা এরজন্য লজ্জিত নয়। এরা দুটি জিনিস আয়ত্ত করেছে। নির্লজ্জ হলেও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে বলবৎকরতে এরা খুবই সফল। দ্বিতীয়ত মনুষ্যত্বকে অমানবিকভাবে হত্যা করেও হিন্দুরা মনুষ্যত্বপূর্ণ, এই সুখ্যাতি বহন করে বেড়াচ্ছে।

হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার অন্য বৈশিষ্ট্যটি হল একে সংরক্ষণের বিশেষ কায়দার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এই কৌশলটি দুই ধরনের।

প্রথম কৌশলটি হল, হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থাকে তুলে ধরা। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে দেশের রাজার ওপরে। মনু পরিষ্কারভাবে বলেছেন :

VIII. ৪১০. "রাজা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মানুষকে বাণিজ্য, টাকা লেনদেন অথবা কৃষি এবং গবাদি পশুর দেখাশোনার জন্য এবং ক্রীতদাসদের দ্বিজ জন্মের কাজের জন্য আদেশ করবেন।"

VIII. ৪১৮. "রাজা খুব-ই সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ব্যবসায়ী এবং বাণিজ্যিক সম্প্রদায়কে যে যার কর্তব্য করার জন্য বাধ্য করতে পারেন। যদি কেউ এই কাজ থেকে সরে যায়, তবে সে এই বিশ্বকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলবে।"

মনু রাজাকে এই কাজে তাঁর কর্তব্য স্থির করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি সুনিশ্চিত করে বলেছেন, রাজা সব সময় প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে চালু রাখবে এবং রক্ষা করবে। মনু এরজন্য আবার দুটি নির্দেশ দিয়েছেন। একটি নির্দেশ হল, রাজা যদি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা চালু রাখতে এবং রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁরও বিচার হবে এবং তিনিও সাধারণ মানুষের মতই শাস্তি পাবেন। নিম্নলিখিত উক্তিগুলি থেকে মনুর নির্দেশনাবলী অনুধাবন করা যায়।

VIII. ৩৩৫. "কোনো পিতা, কোনো শিক্ষক, বন্ধু, মাতা, পুত্র, গৃহ পুরোহিত, যে কেউই নিজের কাজে অবহেলা করলে রাজা তাকে শাস্তি দেবেন।"

VIII. ৩৩৬. "যদি কোনো নীচু জাতের মানুষকে এক আনা জরিমানা করা হয়, তবে নীচু জাতের মানুষটি পুরোহিতের হাতে তার পয়সা দেবে। পুরোহিত সেটি জলে ফেলে দেবে। এই হল পবিত্র নিয়ম।

মনু রাজার বিরুদ্ধে আরো একটি নির্দেশ দিয়েছেন। রাজা যদি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন কিংবা এর প্রতি অবহেলা করেন তবে তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে বিদ্রোহ করবার জন্য নিয়োজিত করবেন।

VIII. ৩৪৮. দ্বিজ জন্মের মানুষদের যদি তাদের কাজে বাধা দেওয়া হয় এবং খুব অসময়ে যদি তাদের কপালে দুর্যোগ নেমে আসে, তবেও তারা অস্ত্র ধারণ করতে পারবে।

ছয়

হিন্দুরা

(হাতের লেখা থেকে গৃহীত)

(১)

এটা অবিশ্বাস্য যে হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের নিজের সমাজে অন্তর্ভুক্ত করবে। তাদের জাত-ব্যবস্থা এবং ধর্ম তাদেরকে এই কাজে উৎসাহিত করবে না। অস্পৃশ্যদের চেয়ে হিন্দুদের মনেই অসম্ভব আশা রয়েছে। তারা অস্পৃশ্যদের একাত্ম করতে পারবে। এই অসম্ভব আশা সৎ হোক অসৎ হোক, এর একটা দিক আছে, যাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই একাত্ম হওয়া কবে আসবে, সে কথা তারা সঠিকভাবে বলতে পারে না। ধরে নেওয়া যাক্—এই আশা খুব সৎ ভাবনা প্রসূত। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই যে, শতাব্দী ধরে এই অঙ্গীভূত হবার কাজ চলবে। ইতিমধ্যে অস্পৃশ্যরা হিন্দুদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কবলে পড়ুক এবং অতীতের মতো অত্যাচার, অবমাননার শিকার হোক। কোন মস্তিষ্ক বিকৃত মানুষও হিন্দুদের এই ইচ্ছার ওপরে নিজেদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিতে পারে না, এই কথা ভেবে যে একদিন হিন্দুরা তাদের অঙ্গীভূত করবে। দীর্ঘদিন কিংবা অল্পদিন পরে হোক, একটা পরিবর্তন আসবেই। হিন্দুদের এই অত্যাচারের অবমাননার বিরুদ্ধে কিছু প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। এই ব্যাপারে কি ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। এই প্রশ্ন যদি অস্পৃশ্যদের করা হয়, তারা দুটি প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বলবে ঃ - একটি সাংবিধানিক নিরাপত্তা, অন্যটি পৃথক ব্যবস্থা।

(২)

সর্ব-ভারতীয় তফসিলি জাতি সম্মেলন, ভারতীয় অস্পৃশ্যদের একটি রাজনৈতিক সংস্থা, তারা অস্পৃশ্যদের রক্ষা করবার জন্য সাংবিধানিক নিরাপত্তার প্রকৃতি কি রকম হবে তা প্রস্তাবের আকারে বর্ণনা করেছে।

তারা যে প্রস্তাব এনেছে, যার নম্বর ছিল ৩ এবং ৭। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

প্রস্তাব নম্বর ৩

(পাতা ৩৫৯)

(MS-ed তে লেখা নেই)

প্রস্তাব নম্বর ৭   (পাতা ৩৬)

(MS-ed তে লেখা নেই)

হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের এই নিরাপত্তার অধীনে আসতে দিতে নারাজ। এর জন্য যে কারণ দেখিয়েছে তা অতীব সাধারণ। বিশেষ নিরাপত্তার জন্য আপত্তিও জানানো হয়েছে। সাধারণ আপত্তি ছিল যে, অস্পৃশ্যরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়। সুতরাং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মতো তাদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই। সুতরাং বিতর্ক চলতে লাগল যে, ধর্মকে কেন্দ্র করেই একটি গোষ্ঠী সংখ্যালঘু কিনা তা প্রতিপন্ন হয়। ধর্মের দিক থেকে দেখতে গেলে অস্পৃশ্যরা তো হিন্দুদের থেকে পৃথক নয়। সুতরাং তারা সংখ্যালঘু কি করে হবে? যারা এইসব নিয়ে বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখছেন তাদের কাছে সংখ্যালঘুর এই ব্যাখ্যা খুব-ই ছেলেমানুষী।

(৩)

অস্পৃশ্যরা সবচেয়ে ক্লিষ্ট দুর্ভাগ্য পীড়িত মানুষ। ইতিহাস-ই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তারা শুধু আত্মবলিই দিয়েছেন। শেলীর ভাষায় বলা যায়—এই অস্পৃশ্যরা স্বর্গ আরোহনে ক্লান্তিতে কাতর পৃথিবীর বুকে সঙ্গীহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশে অসংখ্যা নক্ষত্রের মধ্যে তারা যেন ভিন্নতর।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, অস্পৃশ্যরা পুরোপুরি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ম্যাথু আরনল্ড বলেছিলেন—"নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়েই জীবনের প্রকাশ। এর অর্থ নিজেকে সম্পূর্ণ বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট আলো, যথেষ্ট বাতাস। কোনোমতে তাকে অন্ধকারময় করে দিনে চলবে না।" নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেই হতাশা জন্ম নেয়। নিজের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করতে না পারা নিজের ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারা কিংবা নিজের চেষ্টাকে সার্থক না করে তুলতে পারাই হতাশা। ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় বহু লোক হতাশায় ভুগেছে। কিন্তু আবার নতুন ভাবে জেগে ওঠে। কিন্তু অস্পৃস্যদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। তাদের হতাশা চিরকালের হাতাশা। মহাকাশ, সময় কিছুই তাকে যুক্তি দিতে পারে না।

এইসব কারণে অস্পৃশ্যদের কাহিনীর সঙ্গে ইহুদিদের কাহিনীর মধ্যে তফাৎ রয়ে গেছে। ইহুদিরা যখন মিশরে বন্দী হল, তখন-ই তাদের প্রথম দুর্যোগ নেমে এল। বাইবেলে বলেছে—

[শিশুদের বাইবেল—৩৯ থেকে উল্লেখ]

অবশেষে ফারাও আত্মসমর্পন করে। ইহুদিরা পালিয়ে যায় এবং ক্যানানে আশ্রয় নেয়, ও সেখানকার মধু ও দুগ্ধসমৃদ্ধ ভূমিতে বসবাস শুরু করে।

ইহুদিদের জীবনে দ্বিতীয়বার দুর্যোগ নামে যখন তারা ব্যাবিলনে বন্দী হয়।

(বেশকিছু পাতা হারিয়ে গেছে)

এখন বর্ণনা করা যেতে পারে, অস্পৃশ্যরা কেন হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। তাদের শরীর ও মনের জন্য কোন সুস্থ পরিবেশ ছিল না। তারা আবার জেগে উঠতে পারবে মৃতপ্রায় অতীতে ভবিষ্যতের এমন কোন আশা তাদের ছিল না। এর জন্য তারা দায়ি ছিল না। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা তাদের জন্য ছিল না। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা তাদের জন্য এইরকম সমাজ-ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, যেটা তাদের অগ্রগতির পরিপন্থী ছিল। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ভাগ্যের জন্যই তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

তাদের ভাগ্য অসহ্য হয়ে পড়েছিল। কার্লাইন বলেছেন

(১৫২ পাতা)

(উদ্ধৃতি দেওয়া নেই)

তাদের হতাশার পরিমাণ এইরকম ছিল।

ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি, এই সত্যের অর্থ ব্যাখ্যা করতে হলে ইমারসনের ভাষায় মন ও শরীরের উপযোগী শর্তকে বুঝে নিতে হবে। ইমারসন বলেছেন, সাফল্য নির্ভর করে মন ও শরীরের সুস্থতা, কাজের শক্তি এবং সাহসের ওপরে। সাফল্যর জন্য প্রয়োজন কিছু উপযোগী এবং সদর্থক শক্তি।

যদি ইহুদিরা প্রথম বন্দীদশার পরেই জেগে উঠত, তবে সেটা মূলতঃ তাদের শরীর ও মনের উপযোগী অবস্থা থাকার ফলেই সম্ভব হত। শরীর ও মন সুস্থ থাকে দুটি কারণে। এক ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস। ঈশ্বর আর কিছু না হোক, শক্তির উৎস। জরুরি অবস্থায় মানুষের চাই মনের শক্তি। সাফল্যের জন্য মন ও শরীরের সুস্থতা অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো ভুল নেই যে ইহুদিরা যে সফল হয়েছিল, তার কারণ তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল।

(৪)

সামাজিক পরিবেশের ওপরেও শরীর ও মনের সুস্থতা নির্ভর করে। অবশ্য পরিবেশ যদি অনুকূল থাকে তবেই তা সম্ভব। এমন একটি সমাজ যেখানে গণ্ডী বেঁধে দেওয়া নেই, নিশ্চিন্ত রয়েছে, এমন একটি সমাজ, যেখানে মানুষ শুধু বেঁধে থাকে না, তাদের মঙ্গল সাধন হয়। যেখানে মানুষের কাছ থেকে জোর করে শ্রম আদয় করে না। সকলেই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, প্রত্যেকেই নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে, যাতে প্রিয়জনের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতায় না নামতে হয়, যেখানে যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হয় এবং সকলের প্রতি সকলের সদিচ্ছা রয়েছে।

এই অংশের বাকিটা মুখে গেছে এবং পাঠোপযোগী নেই)

(ওপরের অংশটি ড. আম্বেদকরের হাতের লেখা থেকে গৃহীত। প্রতিটি পৃথক কাগজে লেখা।)

□ □ □

সাত

রাজনৈতিক দমনের সমস্যা

ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার নীতির অনুপ্রবেশ অনেক দেরিতে এবং আস্তে আস্তে এসেছে। এর শুরু ১৮৯২ সাল থেকে, যখন আইন পরিষদের সংবিধানে জনপ্রতিনিধির নীতি বা ভাবনা চালু করা হল। ১৯০৯ সালে এর প্রসার ঘটল। ১৯০৯ সালের জনপ্রতিনিধি ভাবনার দুটি ত্রুটি থেকে গেল। প্রথম ত্রুটি হল ভোটাধিকারকে খুব-ই কেন্দ্রীভূত করা যাতে জনগণের একটি বিরাট অংশ এই আওতার বাইরে রইল। হিন্দু এবং মুসলমানদের অভিজাত শ্রেণী-এর আওতায় রইল। দ্বিতীয় ত্রুটিটা হল, জনপ্রতিনিধির এই প্রকল্পটা শুধুমাত্র আইন পরিষদেই সীমাবদ্ধ রইল। শাসন-ব্যবস্থায় একে প্রয়োগ করা হল না। শাসন-ব্যবস্থা স্বাধীন হয়ে রইল। আইনসভার শাসন-ব্যবস্থার ওপরে কোনও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রইল না। সেটি ঘটল ১৯১৯ সালে। আশ্চর্যজনকভাবে, ১৯১৯ এর পরিকল্পনায়, জনপ্রতিনিধির নীতি শাসন-ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হল। কিন্তু আইন-ব্যবস্থার মত সমানুপাতিক হারে নয়। এরকম ঘটার কারণ হল, ভারতে মূলত: রাজনৈতিক আন্দোলন উচ্চশ্রেণীর দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। তারা ভোটাধিকার প্রসারের চেয়ে শাসন ক্ষমতার ব্যাপারেই বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এটাই স্বাভাবিক। কারণ তারা শাসন ক্ষমতার মাধ্যমে লাভবান হতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে ভোটিধিকারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হত।

উচ্চশ্রেণী শাসন ক্ষমতার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রশংসা পাবার জন্য বেশি আগ্রহী ছিল। ভোটাধিকারের প্রসার না ঘটিয়েই তারা এটি লাভ করত।

১৯০৯ সালে যতটা সীমিত ছিল, তার থেকে ভোটাধিকারের মাত্রা প্রসারিত হল। কিন্তু এতে অস্পৃশ্যরা উপকৃত হল না। বস্তুত: তারা এত দরিদ্র ছিল, যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের অধিকারছাড়া আর কিছু মাধ্যমেই তাদের নির্বাচনের আওতায় আসার উপায় ছিল না।

ভারত সরকার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তারা এই ব্যাপারে সামান্যই করতে পেরেছিল। কিন্তু উচ্চ ব্রাহ্মণদের হাতে অস্পৃশ্যদের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়াতে তারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কেননা ব্রাহ্মণরা

নির্বাচনে অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রদানে অস্বীকৃত ছিল। ১৯১৯ সালের ১৯শে মার্চ ভারত সরকার মন্তব্য করেছিল—

(উল্লেখ)

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার যে প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছিল, তাতে পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। একে বলা হয়েছিল সাম্প্রদায়িক পুরস্কার।

ক। অস্পৃশ্যদের বৈষম্যমূলক ভোটাধিকার থাকবে, যাতে তাদের জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ ভোটদান করতে পারে।

খ। অস্পৃশ্যদের শুধুমাত্র বৈষম্যমূলক ভোটাধিকার থাকবে না, প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাদের জন্য গুটিকতক আসনসংরক্ষিত থাকবে।

গ। সেই সংরক্ষিত আসনে এক মাত্র অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাই ভোট দিতে পারবে।

ঘ। এই পৃথক ভোটাধিকার ছাড়াও অস্পৃশ্যদের দ্বিতীয়বার ভোট দেবার অধিকার থাকবে। তবে এবারে তারা অস্পৃশ্যদের না দিয়ে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের ভোট দিতে পারবে।

ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন, অস্পৃশ্যদের জন্য এই ধরনেরপৃথক জনপ্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা উঠিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি আমরণ অনশন চালিয়ে যাবেন। মহাত্মা গান্ধী পৃথক ভোটারদের জন্য তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এবং ব্রিটিশ সরকার হিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই প্রস্তাব তুলে নিতে অস্বীকৃত হলে মহাত্মা গান্ধী অনশন শুরু করেন। অবশেষে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অস্পৃশ্য এবং হিন্দুদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির নাম পুনা চুক্তি। এর শর্তগুলি এইরকম ছিল।

□ □ □

আট

পুনা চুক্তি

১। প্রাদশিক আইন পরিষদের সাধারণ ভোটারের আসনের মধ্যে অবহেলিত শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষিত হবে।

মাদ্রাজ ৩০টি, সিন্ধু সমেত বোম্বাইতে ১৫টি, বিহার এবং ওড়িশায় ১৮টি, কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলিতে ২০, অসমে ৭, যুক্ত প্রদেশে ২০, সব মিলিয়ে ১৪৮। এই সংখ্যাগুলি প্রাদেশিক পর্ষদের সামগ্রিক শক্তিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এগুলি ঘোষিত হয়েছিল।

২। এই আসনগুলির নির্বাচন নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে যৌথ ভোটার দ্বারা সংগঠিত হবে। অবদমিত শ্রেণীর যে সব সদস্যদের নাম ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন তালিকায় নথিভুক্ত রয়েছে তারা নির্বাচনী কলেজ গঠন করবে। এই নির্বাচনী কলেজ, সংরক্ষিত আসনের প্রত্যেকের জন্য অবদমিত শ্রেণীদের মধ্য থেকে একক ভোটের মাধ্যমে চার জন সদস্যের একটি প্যানেল তৈরি করবে। এই প্রাথমিক নির্বাচনে যে চারজন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তাঁরাই সাধারণ জনগণের দ্বারা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন।

৩। কেন্দ্রীয় আইনসভায় অবদমিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব নির্বাচিত হবে ঐ একই পদ্ধতিতে। যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর মুখ্যব্যক্তির এবং ২নং ধারায় প্রাথমিক নির্বাচনে যেভাবে সংরক্ষিত আসনগুলির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই পদ্ধতিতে। প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও ঐ এক-ই নিয়ম।

৪। ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের জন্য ৮০ শতাংশ আসন নির্ধারিত রইল এবং অবদমিত শ্রেণীর জন্য ঐ পরিষদে আসন সংরক্ষিত করা হল।

৫। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর প্যানেলের প্রাথমিক নির্বাচন ব্যবস্থা উল্লেখিত নিয়মানুসারে হবে এবং এর মেয়াদ দশ বছর পরেও যতদিন না ৬ নং ধারা অনুযায়ী যৌথ চুক্তি অনুসারে তা স্থিরীকৃত না হচ্ছে ততদিন একইভাবে চলবে।

৬। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সংরক্ষিত আসনগুলির মাধ্যমে অবদমিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা এক-ইভাবে চালু থাকবে, যতদিন না এই ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত গোষ্ঠী যৌথ চুক্তি মাধ্যমে আবার তা স্থির করে।

৭। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদে অবদমিত শ্রেণীর জন্য ভোট ব্যবস্থার কথা লোথিয়ান কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা থাকবে।

৮। সরকারি উদ্যোগে নিয়োগ, কিংবা স্থানীয় প্রশাসনে নির্বাচনে ক্ষেত্রে অবদমিত শ্রেণীর সদস্যর অজুহাতে কোনরকম অক্ষমতাকে মেনে নেওয়া হবে না। সরকারি উদ্যোগে নিয়োগের জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার সেই ভিত্তিতে অবদমিত শ্রেণীর জন্য সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করতে সব রকম প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

৯। প্রত্যেকটি প্রদেশের শিক্ষাখাতের অনুদান থেকে অবদমিত শ্রেণীর সদস্যদের শিক্ষাগত সুবিধা দেবার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নির্ধারিত হয়েছিল।

এই অংশটি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সনদ থেকে সংগৃহীত।

(অসমাপ্ত)

□ □ □

নয়

কোনটা অধিকতর মন্দ?

দাসত্ব না অস্পৃশ্যতা

[ড. আম্বেদকর "দাসত্ব এবং অস্পৃশ্যতার" ওপরে এর আগে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আমাদের হাতে যে পুস্তিকা এসেছে তাতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ আছে, কিন্তু উক্ত অংশ নেই।

যে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করা হল, তা খুব-ই যত্নের সঙ্গে পাঠ করা উচিত। বিষয়বস্তুর সততা সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই। এই পুস্তিকার প্রকাশক শ্রী দেবী দয়াল ১৯৪৬-৪৭ সালে ড. আম্বেদকরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুস্তিকার ওপরের শিরোনামটির হস্তলিপি আম্বেদকারের স্বেচ্ছাকৃত স্বাক্ষর। পুস্তিকার শুরুর অনুচ্ছেদ, মানে এক পাতা থেকে ১১ পাতার 'মানবিকতার প্রশ্ন' পর্যন্ত আগে প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যাপারে দিল্লির শ্রী ভগবানদাস কৃতিত্বের দাবি রাখেন।]

ভারতে দাসত্ব

হিন্দুরা অন্য জাতের ওপরে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যে দুটি দাবি করেছে, তার মধ্যে একটি হল ভারতে হিন্দুদের মধ্যে কোনও দাসত্ব নেই, দ্বিতীয়তঃ অস্পৃশ্যতা দাসত্বর চেয়ে কম ক্ষতিকর।

প্রথম মতামতটি একেবারেই মিথ্যে। দাসত্ব হিন্দুদের একটি প্রাচীন প্রথা। মনু একে অনুমোদন করে গেছেন এবং অন্যান্য স্মৃতিলেখকেরা যাঁরা মনুকে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরাও এই নিয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। হিন্দুদের মধ্যে দাসত্ব প্রাচীন প্রথা। ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসে এর অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। এমনকি ব্রিটিশ সরকার যদি আইন করে এগুলি নিষিদ্ধ না করত, তাহলেও আজও এটা অব্যাহত থাকত। যারা অস্পৃশ্য এবং যারা অস্পৃশ্য নয় সকলের ক্ষেত্রেই এই দাসত্ব প্রথা প্রয়োগ হতো।

দারিদ্র্যের কারণবশত উন্নত শ্রেণীর চেয়ে অস্পৃশ্যরাই দাসত্বের শিকার হত। ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত ভারতে অস্পৃশ্যরাই দ্বিজ দাসত্ব—ক্রীতদাসের দাসত্ব এবং অস্পৃশ্যতার দাসত্বের অভিশাপ বহন করত। ক্রীতদাস প্রথা অবলুপ্তির ফলে অস্পৃশ্যরা এর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ। কিন্তু অস্পৃশ্যরা যেহেতু আজ আর দাসত্বের শেকল পড়ে না, তার মানে এই নয় যে এর অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে সমস্ত ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

প্রথম দাবিটা অত ব্যাপক ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়টা ছিল। মহান সমাজ-সংস্কারক এবং অস্পৃশ্যদের বন্ধু লালা লাজপত রায় ও মিস্ মেয়ো কর্তৃক হিন্দু সমাজের অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, অস্পৃশ্যতাকে দাসত্বের সঙ্গেই তুলনা করা চলে এবং তিনি ভারতের অস্পৃস্যদের সঙ্গে আমেরিকার নিগ্রোদের তুলনা করেছিলেন এবং তিনি প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বৈব সত্য। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে?

অস্পৃশ্যতা কি দাসত্বর চেয়ে কম ক্ষতিকর? অস্পৃশ্যতার চেয়ে দাসত্ব কি বেশি অমানবিক? অগ্রগতির ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যদের চেয়ে দাসত্ব কি বেশি প্রতিবন্ধক? লালা লাজপত রায়ের উত্থাপিত বিতর্ক ছাড়াও এই প্রশ্নগুলি খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সবের আলোচনা যেমন আকর্ষনীয় তেমনি তথ্যমূলক। এই পার্থক্য বুঝার সঙ্গে প্রথমে দাসত্ব কথাটির মানে কি তা বুঝে নেওয়া দরকার। এটা খুব-ই জরুরি কেননা দাসত্ব এই শব্দটা সামাজিক সম্পর্কের রূপক মিশ্রিত অর্থেও প্রযোজিত হয়। যেটি দাসত্বের-ই সমতুল্য অথচ দাসত্ব নয়। কারণ স্ত্রী পুরোপুরি স্বামীর অধীনে। স্বামী কখনও তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, কখন তাকে হত্যা করে। কেননা স্বামী তাকে নিজের করে দখল করেছে, সুতরাং তাকে সে নিজের কাজে লাগাবে, সেই অর্থে স্ত্রী ও দাস। ভিন্নতরভাবে দাসত্ব কথাটা ভূমিদাসদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা ভূমিদাসেরা নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট কাজে, ভূমির জন্য নির্দষ্ট অর্থে, নির্দিষ্ট জমিতে কাজ করে। সেই অর্থে তারাও দাস। সেখানেও কোনও স্বাধীনতা নেই। কেননা দাসত্ব মানেই হল স্বাধীনতা খর্ব করা। কিন্তু এটি আইনসিদ্ধ দাসপ্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তর্ক না বাড়িয়ে আইনসিদ্ধ দাসত্বর সঙ্গেই তুলনা করা ভাল।

সাধারণের ভাষায়, একটি ব্যক্তিকে তখনই দাস বলা যাবে, যখন সে অন্যের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়। এই সংজ্ঞাটা সাধারণের পক্ষে খুব-ই সংক্ষিপ্ত। পুরোপুরি ব্যাখ্যা না করলে হয়ত তার অর্থটাই স্পষ্ট হবে না। সম্পত্তি কথাটা এমন

একটি শব্দ যার মাধ্যমে কতগুলি অধিকারকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন ভোগ, ব্যবহার, উপকারিতা, দাবি, বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর, বন্ধক, লিজ কিংবা ধ্বংস করা মালিকানার অর্থ হল সম্পত্তির ওপর পুরোপুরি অধিকার। আরো সঠিকভাবে বলা যায়, দাস হল প্রচুর সম্পত্তি। এর অর্থ হল প্রভু দাসকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাটাতে পারবে। দাস যা উৎপাদন করবে তার অনুমতি ছাড়াই প্রভু তা দখল করবে। প্রভু দাসের অনুমতি ছাড়াই তাকে বিক্রি করতে পারবে, তাকে অন্যের কাছে বন্ধক দিতে পারবে। আরো কঠিনভাবে বলা যায়, প্রভু ইচ্ছা করলে দাসকে হত্যাও করতে পারে। আইনের চোখে দাস হল পদার্থ কোনো বিশেষ মালিক তাকে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করবে।

আইনের এই সংজ্ঞা অনুসারে, দাসত্ব অস্পৃশ্যতার চেয়েও ক্ষতিকর। একজন দাসকে বিক্রি করা চলে, বন্ধক কিংবা লিজ দেওয়া চলে। কিন্তু একজন অস্পৃশ্যকে বিক্রিও করা চলে না, বন্ধক কিংবা লিজ দেওয়া চলে না। একজন দাসকে মালিক যদি হত্যাও করে, তবে তাকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। অস্পৃশ্যতার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। একজন অস্পৃশ্য খুন হলে খুনী দোষী সাব্যস্ত হবে। কোন দাসকে হত্যা করলে তার কোনো শাস্তি হবে না। আইন একে দণ্ডযোগ্য নরহত্যা বলে অভিযুক্ত করতে পারত, মুক্ত নাগরিকের ক্ষেত্রে যেমন করা হয়। কিন্তু আইন অনুযায়ী দাসদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। দাস এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে এই পার্থক্য রয়েছে। এ-সবের জন্য অস্পৃশ্যদের চেয়ে দাসদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

দাসদের অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং এই ব্যাখ্যা একদিকে আইনানুগ। অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত, যদিও এটা সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না। এই অন্যভাবে ব্যাখ্যাটা হল : দাসেরা মানুষ, কিন্তু আইনের চোখে তারা ব্যক্তি নয়। দাসদের ব্যাখ্যা করা খুব-ই জটিল। সেইজন্য প্রয়োজন, আইনের চোখে ব্যক্তি শব্দটিকে মানুষ এই শব্দের সঙ্গে অভিন্ন প্রমাণ করতে হবে। আইনের চোখে যিনি মানুষ আইনের চোখে তিনি ব্যক্তি নাও হতে পারেন। ঠিক এক-ইভাবে ব্যক্তি আইনের চোখে মানুষ না-ও হতে পারে। এর ফলে এমন একটি অর্থের উদ্ভব হচ্ছে, যেটি আইন ব্যক্তি শব্দের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। আইনের উদ্দেশ্য হল, একটি ব্যক্তিকে স্বত্ত্বা হিসাবে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু মানুষকে অর্পণ করা হবে অধিকার এবং কর্তব্যের ঘেরাটোপে। আইনের চোখে একজন দাস মানুষ হলেও ব্যক্তি নয়। আইনের চোখে একটি মূর্তি একজন ব্যক্তি, যদিও সেই মূর্তির কোনও প্রাণ নেই। এই পার্থক্যের কারণ খুবই স্পষ্ট। একজন দাস মানুষ হলেও ব্যক্তি নয়,

কারণ আইন তাকে অধিকার এবং কর্তব্য এই দুটি ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করতে চায়। অন্যদিকে একটি মূর্তি, মানুষ না হলেও ব্যক্তি, কেননা আইন, জেনে অথবা না জেনে তাকে অধিকার এবং কর্তব্য অর্জনের ক্ষমতা দিতে পারবে। ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হওয়া খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কেননা তার কতগুলি পরিণতি রয়েছে। যিনি অধিকার এবং স্বাধীনতা পাবেন। তিনি ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হবার অধিকার পাবেন। তিনি শুধু প্রাণ ধারণের অধিকারী হবেন না, জীবনীশক্তিরও অধিকারী হবেন। তাদের পার্থিব জিনিসের দখলের অধিকার, ভোগ করার অধিকার এবং বিক্রি করার অধিকার থাকবে—অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকার থাকবে। এই পার্থিব জিনিসের অধিকার ছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের অধিকার থাকবে। প্রথমত নিজেদের পরিজনদের ব্যাপারে অধিকার, খুন না হবার অধিকার। আইন অনুসারে অঙ্গহানি বা অস্পৃশ্যতা না হবার অধিকার। এক কথায় জীবনের অধিকার থাকবে। আইন অনুযায়ী তাকে আটক করা চলবে না, অর্থাৎ স্বাধীনতার অধিকার থাকবে। দ্বিতীয়ত খ্যাতির অধিকার, অপমানিত বা লোকের চোখে হেয় প্রতিপন্ন না হবার অধিকার থাকবে, সুখ্যাতির অধিকার অর্থাৎ সম্মান পাবার অধিকার, অর্থাৎ অন্যেরা তার সম্পর্কে যা মনে করুক তাকে খর্ব করা চলবে না। তৃতীয়ত ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা ভোগের স্বাধীনতা থাকবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির উৎপীড়িত না করে আইনসিদ্ধ কাজ করতে দেওয়া উচিত। এবং ব্যক্তি হিসাবে তার প্রাপ্য সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া উচিত। এরজন্য প্রয়োজন ব্যক্তিকে কোনরকম ভাবে উৎপীড়ন না করে তার নিজস্ব জীবিকা খুঁজে নিতে দেওয়া। ঠিক একভাবে প্রতিটি মানুষের অধিকার থাকবে জনপথ, নৌ-চালনার উপযোগী নদী এবং জনসাধারণের মঙ্গলার্থে রাখা দ্রব্য ব্যবহারের

---

* ক্ষমতা, অধিকার এবং স্বাধীনতা এদের মধ্যে তফাৎ আছে, সাধারণদের তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে হবে। যখন একজন ব্যক্তির অধিকার থাকবে তখন এর অর্থ হল অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে তার কর্তব্য রয়েছে অর্থাৎ তার কর্তব্যকে পরিপূর্ণ করে তার অধিকারকে বাস্তবায়িত করা অথবা ভুল কাজ করে অন্যের অধিকারকে খর্ব না করা।

অধিকার এবং স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যাপকভাবে তার প্রয়োগ করতে গেলে অধিকারের মধ্যে স্বাধীনতাকে ঢুলিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, একজন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে অর্থাৎ তার নিজের যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু এই কথাকে বাদ চলে গেছে যে একজন ব্যক্তির অপরের ব্যাপারে কোনো স্বাধীনতা থাকতে পারে না। অধিকার এবং স্বাধীনতার তফাৎ এইভাবে করা হয়েছে। ব্যক্তির অধিকার অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নিজের

স্বাধীনতা এমন ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা সংযত না হলেও চলে। ব্যক্তির আইনসিদ্ধ স্বাধীনতা এমন ধরণের কাজের কথা বলে, যাতে আইন তাকে একাও করে দিতে পারে।

সুযোগ দেওয়া। প্রতিটি মানুষ আইনকে নিজের রক্ষার্থে যাতে ব্যবহার করতে পার সেই অধিকারও তাকে দিতে হবে। তৃতীয়তঃ জালিয়াতি বা দমননীতির হাত থেকে রেহাই পাবার অধিকার তার থাকবে যা তার ক্ষতি করবে এমন জিনিসকে সে যাতে এড়িয়ে চলতে পারে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কিছু করতে যেন বাধ্য না করা হয়। চতুর্থতঃ সমবেতভাবে মানুষ এমন অধিকার ভোগ করবে যাকে পারিবারিক অধিকার বলা যেতে পারে। এই পারিবারিক অধিকারকে বৈবাহিক, পৈত্রিক, অভিভাবকত্ব এবং সন্তানাদি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাগ করা যেতে পারে। বৈবাহিক অধিকার হল এমন অধিকার যাতে স্বামীর কাছ থেকে বিশ্বের কোন শক্তি, গায়ের জোরে হোক, অথবা ভুলিয়ে হোক, তার স্ত্রীর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। স্ত্রীর ক্ষেত্রেও সেই এক-ই কথা প্রযোজ্য। আমেরিকার বহুলাংশ এইভাবে গৃহীত হয়েছে। পৈত্রিক অধিকার হল এমন অধিকার, যাতে শিশুর অভিভাবকত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার পিতামাতার ওপরে থাকবে এবং পিতামাতা যতদিন না তার সন্তানকে নিজে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে না পারে, ততদিন তার অভিভাবকত্ব চালিয়ে যাবে। অভিভাবকত্বের অধিকার এমন অধিকাব, যাতে পিতামাতার মঙ্গল হয় না, মঙ্গল হয় সন্তানের। পিতা সন্তানের ভালো মন্দ দেখভাল করবেন, এটি হল সেই সংক্রান্ত অধিকার। প্রভুত্বের অধিকার হল এমন ধরণের অধিকার যার মাধ্যমে সন্তানের শ্রমকে ব্যবহার করা যেতে পারে। হত্যা করে, কিংবা আঘাতের মাধ্যমে তাকে পঙ্গু করে কিংবা বিপথে চালিত করে এই অধিকারকে লঙ্ঘন করা হত।

ক্রীতদাস যেহেতু একজন ব্যক্তি নয়, সেহেতু আইনের চোখে তার এ-সবের কোনো অধিকার নেই। আইনের চোখে অস্পৃশ্যরা ব্যক্তি। সুতরাং আইন ব্যক্তিদের যে অধিকার দেয়, এটা বলা যাবে না যে অস্পৃশ্যরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। তার সম্পত্তির অধিকার, জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা, সম্মান, পরিবার এবং স্বাধীনতার অধিকার আছে এবং তার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আছে। দাসেরা হল সম্পত্তির এমন কোন অংশ অথবা এমন একটা কিছু, যাকে ব্যক্তি বলা যাবে না। সুতরাং অস্পৃশ্যদের চেয়ে দাসদের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়।

ক্রীতদাসদের আইনানুযায়ী পরিস্থিতি এইরকম ছিল। এবারে আমরা রোমান সাম্রাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীতদাসদের অবস্থা কিরকম ছিল তা মি. ব্যারোর উক্তি থেকে খতিয়ে দেখি। হিদারটো ছিল ক্রীতদাসদের সংসার। সেখানকার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এ ছাড়া অন্য একটি দিক ছিল। পুস্তিকাতে সমস্ত

গৃহস্থালীকে যা স্বাভাবিক সেইভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটি ছিল তার ব্যতিক্রম। ক্রীতদাসরা এখানে সংখ্যায় প্রচুর ছিল ঠিক-ই এবং রোমেই এদের বেশি দেখতে পাওয়া যেত। ইটালিতে এবং তার প্রদেশগুলিতে তুলনায় কম ছিল। অনেক ক্রীতদাস কর্মী জমি এবং তার উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মালিকও দাসের সম্পর্ক সেই প্রাচীনকালের মতোই ছিল। ক্রীতদাসরা ছিল নীচু শ্রেণীর কর্মী। প্লিনির তার কর্মীদের প্রতি যে সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছিলেন তা সকলেরই জানা। এর কারণ এইরকম ছিল না যে, তিনি তার মহত্ত্ব প্রমাণের জন্য কিংবা আগামী প্রজন্মের কাছে ক্রীতদাসদের অসুখে কিংবা মৃত্যুতে তিনি কতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন তা প্রমাণের জন্য তিনি এরকম করতেন, তা নয়। প্লিনির সংসার ছিল ক্রীতদাসদের প্রজাতন্ত্র। ক্রীতদাসদের প্রতি প্লিনির ব্যবহার ছিল স্বাভাবিকের থেকে অতিরিক্তি ভাল। অন্য কোনরকম মনোভাব পোষণের কোন কারণই ছিল না।

জাহির করা কিংবা সাহিত্যের প্রতি আনুগত্যের কারণে ধনী পরিবারগুলি সাহত্যে এবং শিল্পকলায় নিয়োজিত করার জন্য শিক্ষিত ক্রীতদাসদের নিজেদের গৃহে রাখতেন। সেনিকা ক্যালভিসিসেস সারি বলেছিলেন যে, এমন এগারোজন ক্রীতদাসকে রাখতে, যারা হোমার, হিসিওইড প্রমুখ নজন গীতি কবির সাহিত্যকে মুখস্থ রাখতে পারে। একজন ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছিল, "তাহলে বইয়ের আলমারিগুলি সস্তা হয়ে যাবে।" তার প্রত্যুত্তর ছিল না। বাড়ির মালিক যা জানবে, পরিবারবর্গ সেই রকমই জানবে। এসব/ছাড়াও ছাপার অভাবে শিক্ষিত ক্রীতদাসদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ব্যস্ত আইনজীবি, চারুকলার প্রতি অনুরাগী কবি, দার্শনিক, শিল্পকলার প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিদের অনুলিপি লেখক, পাঠক এবং সম্পাদকের প্রয়োজন ছিল। এই ব্যক্তিরা ভাষাবিদ, গ্রন্থগারিক ছিলেন। সরকারি, বেসরকারি লাইব্রেরিতে এদের দেখতে পাওয়া যেত। এই সময়ে সর্টহ্যান্ডে লেখারও খুব-ই চল ছিল। দলিল পত্রাদি এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ক্রীতদাসদের নিয়মিত নিয়োগ করা হত।

বিশেষ গ্রন্থে স্নিটোনিয়াস বহু স্বাধীন ব্যক্তি, বক্তা এবং বৈয়াকরণের উল্লেখ করেছেন। ভেরিয়াস ক্ল্যাকাস অস্টাসের নাতিদের শিক্ষক ছিলেন। মৃত্যুর পরে জনপথে মর্মর মূর্তিস্থাপন করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল। স্ক্রিবনিয়াস অ্যাগ্রো ভিসিয়াস ক্রীতদাস ছিলেন এবং অরবিলাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে স্ক্রিবেনিয়াস তাঁকে মুক্ত করে দেন। হাইজিনাস পালাটাইন লাইব্রেরির গ্রন্থগারিক ছিলেন। এর পরে তার নিজের মুক্তপ্রাপ্ত ক্রীতদাস জুলিয়াস মতেসটাস গ্রন্থগারে

নিয়োজিত হন। আমরা ক্রীতদাস দার্শনিকের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ঐতিহাসিকের কতা শুনেছি, যাঁকে প্রভুর ক্রীতদাস বন্ধুদের সঙ্গে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস স্থপতির সঙ্গে তর্ক করতে উৎসাহ দেওয়া হত। শিলালিপিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ডাক্তারের উল্লেখ আছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাদের পরিবারবর্গে ক্রীতদাস রূপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। একটি কি দুটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। দাসত্ব মোচনের পরে তাদের ক্রমোন্নতি হত। পরে তারা উচ্চমূল্য ছাড়া কাজ করতে রাজি হত না।

আমাদের বেশ কিছু লোক চাইত নর্তকিদের, গায়কদের, বাদ্যযন্ত্রকারীদের বিভিন্ন ধরনের শিল্পীদের ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের যেন দরকার লাগলেই পাওয়া যায়। ক্রীতদাসদের মধ্যেই এদের সংখ্যা বেশি ছিল। শিক্ষক দ্বারা এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। অনেকে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অগস্টাসের সময় থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে লাগল। ক্রীতদাসরা আগে শিল্পকলায় নিয়োজিত হত। কিন্তু হঠাৎ বাণিজ্যের প্রসারে তাদের নিয়োগ আবিশ্যিক হয়ে উঠল। অন্য ক্ষেত্রে এরা অনাবশ্যক হয়ে গেল। রোমানরা খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ও শিল্প উদ্যোগে নিজেদের নিয়োজিত করল। সুতরাং দালালের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বাণিজ্যিক প্রসার যত হতে লাগল, তত দালালদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ক্রীতদাস রাইলেন দালাল, কেননা ক্রীতদাসদের সঙ্গে চুক্তির রদবদল করা যেত। চুক্তিকে কখনও কখনও এতটাই শিথিল করা যেত যে, সম্পত্তি এবং স্বাধীনতার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যেত। আবার কখনও কখনও এতটাই অনমনীয় ছিল যে কোনো ক্রীতদাসের খারাপ ব্যবহারের ফলে কোন কাজ যাতে হাত ছাড়া না হয় সেই ব্যাপারে মালিককে সুনিশ্চিত করতে হত। মালিক এবং ক্রীতদাসের মধ্যে ব্যবসায়িক চুক্তিতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি খুব-ই সাধারণ ব্যাপার ছিল। সেটি সম্পন্ন হলে লাভটা সুবিধাজনক হত। ক্রীতদাসদের জমির খাজনা হিসাবে ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। এবং শিল্পে এক-ই ব্যবসা বিভিন্ন আকারে প্রয়োগ করা হত। মালিক একটি ব্যাঙ্ক লিজ দিতে পারতেন, অথবা জাহাজ ব্যবহারের ব্যবসা। এসবের থেকে নির্ধারিত মূল্য অথবা ক্রীতদাসকে যে অর্থ দেওয়া হত তা কমিশন ভিত্তিতে।

আইনে ক্রীতদাসদের আয়টাই ছিল তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। একবার যদি এই আয়টা বাঁচানো যেত, তাহলে সেটি নানা উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যেতে পারত।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খাওয়া, আমোদ-প্রমোদেই সেগুলি ব্যয় হয়ে যেত। কিন্তু এই সম্পত্তি শুধুমাত্র সামান্য সঞ্চয় মনে করার কোন কারণ নেই। সামান্য আয় ও অলসভাবে সেটির ব্যয় হয়েছে তা মোটেও নয়। যে সমস্ত ক্রীতদাস তাদের মালিকের ব্যবসার লাভ করে দিত, তারা নিজেদের লাভটাও দেখত। কি করে নিজের লাভ হবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান তাদের ছিল। কখনও কখনও নিজের টাকা মালিকের ব্যবসার কিংবা উদ্যোগে আকস্মিকভাবে খাটাত। মালিকের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ হত, যাতে সে নিজের বৈশিষ্ট প্রতিপন্ন করতে পারত। অথবা সে তৃতীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হত। তার নিজের সম্পত্তি এবং স্বার্থ দেখভাল করবার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীও রেখে দিত।

ব্যবসার কাজে ক্রীতদাসদের বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা ছিল। কেউ কেউ ছিল দোকানদার। বিভিন্ন ধরনের ফল, রুটি, মাংস, শূয়র, নুন, মাছ, মদ, শাক-সবজি, বিন, তেল, মধু, দই, হাঁস, টাটকা মাছ, বিক্রি করত, কেউ কাপড়, চটিজুতো, জুতো, পোশাক এবং লম্বা ঢিলে কোট বিক্রি করত। রোমে ক্রীতদাসরা মারকাস ম্যাক্সিমান অথবা পরটিকাস ট্রিজেমিনাসের প্রতিবেশীদের কাছে তারা ব্যবসায়িক পণ্য পৌঁছে দিত। এ্যাসকুইলাইন বাজার অথবা গ্রেট মার্ট অথবা সুব্বুরতেও তাদের সামগ্রী পৌঁছে যেত।

পম্পির সিসিলাস জুকানডাসের বাড়িতে যে বিলগুলি পাওয়া গেছে তাতে ক্রীতদাস, সম্পাদক এবং দালালরা তাদের মালিকদের জন্য কি করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেশ যে ক্রীতদাস রাখত এ ব্যাপারে অবাক হবার কিছু নেই। দেশে দেশে যুদ্ধ লেগেই থাকত। বন্দীরা সাম্রাজ্যের সম্পত্তি হয়ে যেত। অবাক হবার মতন ঘটনা হল সাম্রাজ্যে এই সব সরকারি ক্রীতদাসদেব কিভাবে কাজে লাগান হত। তাদের আশ্চর্যজনক পদের অধিকার দেওয়া হত।

"সরকারি ক্রীতদাসরা বিভিন্ন দফতরে রাজ্য কতৃক নিয়োজিত বলে চিহ্নিত হত। এবং তাদের বিশেষ সামাজিক মূল্য দেওয়া হত। রাজ্য ক্রীতদাসদের কাজ, শহরের ক্রীতদাসদের, সিজারের ক্রীতদাসদের আমাদের সময়কার উচ্চপদস্থ কিংবা নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের এবং মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কর্মচারীদের মধ্যে ক্লার্ক কিংবা অর্থদফতরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা প্রায় সকলেই ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাস। ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ের কাজ চলত। টাকশালের ওপরওয়ালা ছিলেন একজন নাইট। যিনি টাকশালের দায়িত্বে ছিলেন।

তারপরের পদে যিনি ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস, আরো মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসদের সেখানে নিয়োজিত করা হয়েছিল। সরকারি চাকরির একটি শাখা থেকে ক্রীতদাসদের বিতাড়িত করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীতে থেকে তাদের যুদ্ধ করতে দেবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কেননা মনে করা হত, তারা এই সম্মানের যোগ্য নয়। এর পেছনে অন্য কারণও ছিল। সেনাবাহিনীতে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়াটা খুবই বিপজ্জনক মনে করা হয়েছিল। যাই হোক ক্রীতদাসরা সরাসরি যুদ্ধের খুবকমই অংশ নিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের সঙ্গে নিযুক্ত দাস হিসাবে তাদের সংখ্যা ছিল অনেক। পরিবহন এবং অন্যান্য সরবরাহ ক্ষেত্রেও তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

রোমে ক্রীতদাসদের আইনসঙ্গত অবস্থা এইরকম ছিল। এবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীতদাসদের অবস্থা কি রকম ছিল তাই দেখা যাক্। বেশ কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

"লেফাইয়েট নিজে লক্ষ্য করে দেখেছিলেন যে, কৃষ্ণকায় এবং শ্বেতকায় নাবিকরা এবং সৈন্যরা একত্রে বিপ্লবের সময়ে পার্থক্য না রেখে যুদ্ধও করেছিল। আবার তালগোলও পাকিয়ে দিয়েছিল। গ্রান্ভিলে কাউন্টির পদদেশে উত্তর ক্যারোলিনায়, একটি পুরোপুরি নিগ্রো জন্ চ্যাভিস্ প্রিন্সটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শিখে শ্বেতকায় ছাত্রদের জন্য একটি বেসরকারি বিদ্যালয় চালাচ্ছিলেন। এবং স্থানীয় প্রেসবাইটারিতে অনুমতিও পেয়েছিলেন। ফলে রাজ্যের শ্বেতকায়দের জমায়েতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। তাঁর একজন ছাত্র উত্তর ক্যারোলিনার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং অপর একজন ছাত্র দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হুইগ সিনেটের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর দুজন ছাত্র উত্তর ক্যারোলিনার প্রধান বিচারকের পুত্র ছিল। দেশের সামরিক অকাদমির প্রতিষ্ঠাতার পিতা তাঁর স্কুলে এবং তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

ক্রীতদাস কর্মীদের সবরকম কাজে ব্যবহার করা হত। সবেচেয়ে বুদ্ধিমান নিগ্রো ক্রীতদাসদের কারিগরের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত এবং পরে বিক্রি করে দেওয়া হত। কারিগর ক্রীতদাসেরা সাধারণ ক্রীতদাসদের চেয়ে বেশি রোজগার করতে পারত। মালিক কারিগরদের নিজেদের কর্মী ছিল। বেশ কিছু মালিক কারিগর নিগ্রোদের সাহায্যের জন্য ক্রীতদাস কিনতেন। অনেক কারিগর ক্রীতদাস নিজেদের সঞ্চয় দিয়ে স্বাধীনতা কিনতে পারতেন। সাধারণ শ্রমিকরা তা পারত না।

বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে ক্রীতদাসদের পালিয়ে যাওয়া কিংবা বিক্রির উল্লেখ থেকেই এদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা গরিব শ্বেতকায় কর্মীদের সমান কিংবা তার চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেত। এবং মালিকের প্রভাবে সবচেয়ে ভালো চাকরি পেত। রাজমিস্ত্রি এবং ছুতোর মিস্ত্রিদের চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা ১৮৩৮ সালে জর্জিয়া এবং এথেন্সে যারা কাজ করত, তারা নিগ্রো কর্মীদের বেশি মূল্য যাতে না দেওয়া হয়, তার জন্য আবেদন করেছিল। শ্বেতকায় মানুষেরাই এদেশের আসল আইনসম্মত, বিধিসম্মত মালিক। যেদিন থেকে কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিও আবিস্কার করলেন যে, পৃথিবী গোল এবং এর ফলে উৎসাহিত হয়ে কলম্বাস পশ্চিম দিকে ভূমির সন্ধানে সমুদ্র যাত্রা করলেন, সেদিন থেকে শ্বেতকায়দের প্রভূত্ব স্থাপিত হল। শুধুমাত্র শ্বেতকায়রাই এই নতুন মহাদেশ আবিস্কার করল আর তাদের কাছ থেকেই তোমরা অর্থের বিনিময়ে রুটি কিংবা বস্ত্র ক্রয় করতে অস্বীকার করছ? যে অর্থ দ্বারা তাদের দুর্গত পরিবার প্রতিপালিত হবে? এর অর্থ দাঁড়ায়, তাদের কর্মহীন করা এবং নিগ্রোদের দর কষাকষিতে সহায়তা করা।

১৮৫৮ সালে আটলান্টায় কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস কারিগরদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ২ জন শ্বেতকায় মিস্ত্রি এবং শ্রমিক ক্রীতদাসদের মালিকের কাছে স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা দেয়। পরবর্তী বছরে কয়েকজন শ্বেতকায় নাগরিক শহরে একজন নিগ্রো দাঁতের ডাক্তার তার পেশা চালু রাখার ব্যাপারে নগর পর্যদ কোনো প্রতিবাদ না করায় বিক্ষুব্ধ হন। আমাদের প্রতি সুবিচার প্রদর্শনের জন্য এগুলি নিষিদ্ধ করা উচিত। আমরা আটলান্টায় অধিবাসীরা তোমার কাছে বিচারের জন্য আবেদন করছি। ১৮১৯ সালে জর্জিয়ার রিচমন্ড কাউন্ট্রিতে স্বাধীন নিগ্রোদের যে সংখ্যা গননা হয়, তাতে দেখা যায় যে নিগ্রোদের ছুতোর মিস্ত্রি, নাপিত, ঘোড়ার জিন বিক্রেতা, সুতো কাটে এমন ব্যক্তি, কারখানার মেরামতকারী, পিস্তল রাখার খাপ বিক্রেতা, তাঁতী, ভারবাহী জন্তুর সাজসরঞ্জাম নির্মাতা, কাঠ চেরাই কারখানার তত্ত্বাবধায়ক, বাষ্পীয় পোতের চালক প্রমুখ জীবিকা ছিল। রাষ্ট্রপতি মুনরো একজন নিগ্রো জুতো কারিগরের হাতে তৈরি জুতো পড়েই তার ঐ পেশার উদ্বোধন করেন। মন্টিসিলোতে টমাস জেফারসনের নিগ্রো মজুরদের তৈরি টাইলস্ দেওয়া সুচারু মেঝে দেখে হ্যরিয়েট মারটিন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এখনো বড় বড় খামার বাড়িগুলিতে নিগ্রো কারিগরদের দক্ষতার ছাপ রয়েছে। বিশাল মজবুত বাড়িগুলো তারা তৈরি করেছিল ওক গাছের কাঠ দিয়ে এবং বড় বড় কাঠের খুঁটিগুলি তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করেছিল কাঠ থেকে তৈরি পিন দিয়ে। নিগ্রো মহিলারা মিলে তাঁত বোনা এবং সুতো কাঠায় পটীয়সী

ছিল। ১৮৩৯ সালে বাকিংহাম এথেন্সে এবং জর্জিয়ার এইসব নিগ্রো মহিলাদের শ্বেতকায় মেয়েদের পাশাপাশি কোনরকম বীতরাগ সৃষ্টি না করেই কাজ করতে দেখেছে।

দক্ষিণের নিগ্রো কারিগররা উত্তরের নিগ্রোদের চেয়ে বেশি মূল্য পেত। ১৮৫৬ সালে ফিলাতেন কিয়াতে সংস্কারমূলক প্রতিবন্ধকতার জন্য রেজিষ্ট্রীকৃত ৯,৬৩৭ জন নিগ্রো কারিগরদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরও কম তাদের পেশা চালু রাখতে পেরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে সব আইরিশ আমেরিকায় আসতে শুরু করেছিল, উত্তরে তাদেরকে কাজে লাগানো হত এবং নিগ্রো ক্রীতদাসদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা হত তাদের সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করা হত। একজন আইরিশ ক্যাথলিক সে পরিস্থিতিতে কোনো কাজে বহাল হত, তার থেকে তার অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোনো চেষ্টাই করত না। কিন্তু একজন নিগ্রো তার অস্পষ্ট উন্নতির জন্য চেষ্টা করত এবং কৃতকার্য হত। প্রাচীনপন্থী অলিভার ক্রমভয়েল, কৃষকায় ক্রীতদাসদের যখন বিক্রি করতেন, তখন যে সমস্ত আইরিশ বারবাভোসে দ্রগেদা ধ্বংসলীলায় মারা যায় নি, তাদেরকেও বিক্রি করে দেন নি। নিউইয়র্ক এবং পেনসিনভেনিয়ার মুক্ত এবং পলাতক নিগ্রোদের সঙ্গে এই দলের অনবরত সংঘর্ষ লেগে থাকত, ফলে নিউইয়র্কে দাঙ্গা লেগে থাকত। এই হাইবারনিয়ানের মালবহন এবং সাধারণ মজুরদের চাকরি নিয়ন্ত্রণ করত এবং নিগ্রোদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা তাদের আমেরিকাতে ক্ষমতা এবং বিভিন্ন ধরনের জীবনধারণের উপায়ের ওপর আঘাত বলে মনে করত।

রোমান ক্রীতদাস এবং নিগ্রো ক্রীতদাসদের আইনসম্মত অবস্থা এইরকম ছিল। কিন্তু ভারতের অস্পৃশ্যদের অবস্থা কি রোমান ক্রীতদাস কিংবা আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাসদের মত ছিল? রোমান সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের অবস্থার তুলনা এক-ই সময়ের ঘটনা বলে উল্লেখ করাটা অন্যায় কিছু হবে না। কিন্তু আমি রোমান সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসদের সঙ্গে বর্তমান যুগের অস্পৃশ্যদের অবস্থার তুলনা করতে রাজি আছি। কারণ একদিকে খুব-ই খারাপ, অন্যদিকে খুব-ই ভাল, এই দুয়ের মধ্যে তুলনা হবে। কেননা অস্পৃশ্যদের পক্ষে বর্তমান সময়টা তো স্বর্ণযুগ বলা চলে। অস্পৃশ্যদের আইনসম্মত অবস্থা এবং ক্রীতদাসদের আইনসম্মত অবস্থা কি রকম ছিল তুলনা করে দেখা যাক। রোমে ক্রীতদাসদের মতো কতজন অস্পৃশ্য এদেশে গ্রন্থাগার, সর্টহ্যান্ড লেখক এবং শ্রুতিলেখকের পেশায় নিযুক্ত ছিল? রোমের ক্রীতদাসদের মতো কতজন অস্পৃশ্য বুদ্ধিজীবির পেশা যেমন দার্শনিক, শিক্ষক, বৈয়াকরণ, শিল্পী কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন? কতজন

অস্পৃশ্য রোমের ক্রীতদাসদের মতো ব্যবসা, বাণিজ্য এবং শিল্পে নিয়োজিত হয়েছিল? এমনকি নিগ্রোরা যখন ক্রীতদাসও ছিল, তখনকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেও বলা যায়, তাদের অবস্থা অস্পৃশ্যদের অবস্থার থেকে উন্নতমানের ছিল। কোনও অস্পৃশ্য কারিগর হয়েছ এমন কোনও উদাহরণ আছে? এমন কোনও উদাহরণ আছে কি, একজন অস্পৃশ্য বিদ্যালয় পরিচালনা করছ, তার অধীনে ব্রাহ্মণ সন্তানরা পড়াশুনা করছে? এরকম ভাবনা অভাবনীয় কেন ছিল? কিন্তু আমেরিকায় তো এইরকম ঘটনাই ঘটেছিল। রোমান ক্রীতদাস এবং আমেরিকার ক্রীতদাসের সঙ্গে আমি অস্পৃশ্যদের বর্তমান অবস্থার তুলনা ইচ্ছাকৃতভাবেই করছি। কেননা বর্ত্তমান অবস্থা তো অস্পৃশ্যদের কাছে স্বর্নযুগ বলা চলে। ঐতিহাসিকরা তখনকার ক্রীতদাসদের অবস্থাকে বর্বরোচিত বলে বর্ণনা করেছেন। আর বর্তমান যুগের অস্পৃশ্যরাও তো নিপীড়িত জাত। তাহলে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, অস্পৃশ্যদের অবস্থা ক্রীতদাসদের চেয়েও খারাপ। মানুষের ক্রমোন্নতির পক্ষে অস্পৃশ্যদের অবস্থা ক্রীতদাসদের চেয়েও শোচনীয়। এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে। ক্রীতদাসদের অবস্থা আইনের কাছে খারাপ হলেও অস্পৃশ্যদের চেয়ে ভাল ছিল, আবার অস্পৃশ্যদের অবস্থা আইনের কাছে ভাল হলেও তাদের অবস্থা ক্রীতদাসদের চেয়েও খারাপ ছিল। এই ব্যাখ্যা কি পরিহাসপূর্ণ? সব প্রশ্নেরও প্রশ্ন হল যে, কার সাহায্যে ক্রীতদাসরা আইনের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেল এবং নিজেদের উন্নতি ও প্রসার ঘটাতে পারল? সে আইন অস্পৃশ্যদের স্বাধীনতা দিল, অথচ অস্পৃশ্যরা তা উপভোগ করতে পারল না। তাদের জীবনীশক্তি লুপ্তপ্রায় হল এবং ক্রমোন্নতি রুদ্ধপ্রায় হয়ে গেল?

এই পরিহাসপূর্ণ ব্যাখ্যার উত্তর খুব-ই সোজা। জনমত এবং আইনের সম্পর্ক উপলব্ধি করলে তার সহজ উত্তর পাওয়া মুস্কিলের হবে না। আইন এবং জনমত মানুষের আচরণকে চালিত করে। তারাই কাজ করে, আবার তারাই প্রতিক্রিয়া জানায়। আইন জনমতের কাছে উত্তর পেতে চায়, একে নিয়ন্ত্রণ করে, তারপর জনমত যেমন চায় তেমনভাবে চালনা করে। কোনো কোনো সময় জনমত-ই আইনের চালক। আইনের কঠোরতাকে জনমতই পরিবর্তন করে আবার স্বাভাবিকভাবে গড়ে তোলে। কখনও কখনও আইন এবং জনমত পরস্পর বিরোধী হয় এবং জনমত-ই বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং আইন যা নির্দেশ করে তাকে বাতিল করে দেয়। বাণিজ্য কিংবা ব্যবসার সুবিধার জন্যই হোক, শ্রেষ্ঠ কিছু পাওয়ার ইচ্ছায় নিজের স্বার্থের বশবর্তী হচ্ছে হোক, ক্রীতদাসদেরকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করেই হোক, কিংবা মানবতার বশবর্তী হয়েই হোক,

রোম কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাসদের অবস্থা সম্পর্কে জনমত এবং আইন কখনও একমত হতে পারেনি। উভয় দেশেই আইনের চোখে ক্রীতদাসরা আইনসম্মত ব্যক্তি নয়। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের চোখে তারা মানুষ। অন্যভাবে বলা যায়, আইন ক্রীতদাসদের ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃত হয়েছিল। সমাজ তাকে সেই সম্মান দিয়েছে। এখানেই ক্রীতদাসদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের তফাৎ। অস্পৃশ্যদের ব্যক্তিহিসাবে যে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃত হয়েছিল, সমাজ তাকে বাধা দিয়েছে। ক্রীতদাসদের আইন ব্যক্তিহিসাবে স্বীকৃত না দিয়ে অতটা ক্ষতি করতে পারেনি, কেননা সমাজ তাদের পর্যাপ্ত দিয়েছে। কিন্তু অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে আইন তাদের ব্যক্তিহিসাবে স্বীকৃতি দিয়েও কিছু করতে পারেনি। কেননা হিন্দু সমাজ সেই স্বীকৃতি দানে বাধা দিয়েছে। আইন স্বীকৃতি না দিলেও ক্রীতদাসদের ব্যক্তিহিসাবে পরিচয় রয়েছে। কিন্তু একজন অস্পৃশ্য আইনের স্বীকৃতি পেয়েও ব্যক্তিহিসাবে তার অস্তিত্বের কোনও মূল্য নেই। এই পার্থক্যটাই মৌলিক। এটা একটা ধান্ধা তৈরি করতে পারে। আইনের দাসত্ব ভোগ করেও ক্রীতদাসরা উন্নতি করার কথা ভারতে পারে, অথচ অস্পৃশ্যরা আইনের স্বাধীনতা ভোগ করেও ক্রীতদাসরা উন্নতি করার কথা ভাবতে পারে, অথচ অস্পৃশ্যরা আইনের স্বাধীনতা ভোগ করেও সমাজের কোন পদমর্যাদা পাবার মতো অধিকার তাদের নেই।

যারা ক্রীতদাস প্রথার নিন্দা করেন, তারা ভুলে গেছেন যে ক্রীতদাসপ্রথার মধ্য দিয়ে ব্যবসা, কারিগরি এবং শিল্পের শিক্ষানবিশী চালু করা হয়েছিল। স্বাধীনতা হীনতার ক্ষতিপূরণ না করে ক্রীতদাস প্রথাকে অব্যাহত করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কিন্তু একটি ব্যক্তিকে আটক করে রেখে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া স্বাধীনতার অজুহাতে বর্বর ব্যবহারের চেয়ে অনেক ভাল। ক্রীতদাস প্রথার অর্থ হল, সভ্যতার বিনিময়ে আধা বর্বর প্রথার চালু করা। যখন স্বাধীনতা পাওয়া যাবে, তখন সভ্যতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার সম্ভব। কিন্তু ক্রীতদাসপ্রথা হল শিক্ষানবিশী কিংবা অধ্যাপক মাইব্রেসের ভাষায় "উন্নত সংস্কৃতির প্রবর্তক" বলা যায়।

ক্রীতদাসপ্রথা সম্পর্কে এই মতটাই যথার্থ। এই প্রশিক্ষণ, সংস্কৃতির এই উদ্যোগ, নিঃসন্দেহে ক্রীতদাসদের পক্ষে আশীর্ব্বাদ বলা যায়। সমানভাবে মালিকরাও এতে উপকৃত হয়েছেন। তারা তাদের ক্রীতদাসদের শিক্ষিত করেছেন, তাদের সংস্কৃতিতে ব্রতী করেছেন। "দাস প্রথা চালু হবার আগে শিক্ষিত এবং দক্ষ দাস খুব-ই কম পাওয়া যেত।" এইজন্য তরুণ ক্রীতদাসেদের যখন গৃহের কাজে কিংবা কোনও কারিগরির কাজে নিয়োগ করা হত, তাদেরকে শিক্ষিত করা হত। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ক্যাটো, এন্ডারের রাজত্বে করা হয়েছিল। তাদের মালিক কিংবা

কর্মীরা এদেরকে শিক্ষিত করত। ধনীদের ঘরে এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ব্যক্তি নিযুক্ত থাকত। শিল্প, বাণিজ্য, কলা, বিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত।

প্রশ্ন হল, ক্রীতদাসদের উন্নত সংস্কৃতিতে কেন ব্রতী করা হল, অথচ অস্পৃশ্যরা কেন এর থেকে বিচ্যুত হল? এই প্রশ্নটা খুব-ই প্রাসঙ্গিক। সেইজন্য আমি এই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছি। এই প্রশ্নের উত্তরে সেই সিদ্ধান্তে আবারও উপনীত হতে হবে যে, অস্পৃশ্যতা দাসত্বর চেয়েও খারাপ। কেননা একজন ক্রীতদাস তার ব্যক্তিসত্ত্বার মূল্য পায়, কিন্তু একজন অস্পৃশ্য তা পায় না।

এখন প্রশ্ন হল, মালিকরা তাদের ক্রীতদাসদের শিক্ষিত করার জন্য এবং শ্রমের ও সংস্কৃতির উচ্চ পথে ব্রতী করার জন্য এতটা কষ্ট কেন করেছিল? তার উত্তর নিঃসন্দেহে-ই বলা যায় লাভের আশায়। একজন দক্ষ ক্রীতদাস একজন অদক্ষ ক্রীতদাসের চেয়ে বেশি বস্তু হিসাবে বেশি মূল্যবান। বিক্রি করলে সেই বেশি মূল্য আনতে পারবে। ভাড়া দিলে বেশি মজুরি নিয়ে আনতে পারবে। মালিকের এটা বিনিয়োগে বলা যেতে পারে। কিন্তু ক্রীতদাসের উন্নতি এবং অস্পৃশ্যদের অধঃপতনের এটিই একমাত্র কারণ নয়। ধরা যাক, রোমান সমাজ ক্রীতদাসদের কাছ থেকে সবজি, দুধ, মাখন, জল অথবা মদ কেনার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে। ধরা যাক রোমান সমাজ ক্রীতদাসদের তাদেরকে স্পর্শ করা, তাদের বাড়িতে প্রবেশ করা, গাড়িতে তাদের সঙ্গে চলাফেরা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তাহলে মালিকরা কি ক্রীতদাসদের শিক্ষিত করতে পারবে? আধা বর্বর জীবন থেকে সাংস্কৃতিক জগতে নিয়ে যেতে পারবে? নিশ্চয়-ই নয়? তার কারণ, ক্রীতদাসদের অচ্ছ্যুত ভাবা হত না। তাই তাদের শিক্ষিত করা বা দক্ষ করা সম্ভব হয়েছে। আমরা আবার সেই পুরোনো সিদ্ধান্তে ফিরে যাই যে, সমাজ ক্রীতদাসদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে মূল্য দিয়েছে। হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্যদের ব্যক্তি সত্ত্বাকে মূল্য দেয় নি, মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেশার, স্বাভাবিক ব্যবহার পাবার সুযোগ দেয় নি।

রোমে ক্রীতদাসদের মানুষ বলে গণ্য করা হত। যদিও তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তবুও তাদের সামাজিক আদান-প্রদানের অধিকার ছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয়, রোমান ধর্ম ক্রীতদাসদের অনুমোদন করেছল। সমীক্ষায় দেখা গেছে—

"রোমান ধর্ম ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে কখনও যায়নি। তাদের মন্দির ক্রীতদাসদের কাছে কখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। তাদের উৎসব থেকে ক্রীতদাসদের সরিয়ে রাখা

হয়নি। ক্রীতদাসদের যেমন বিশেষ কিছু উৎসব থেকে সরিয়ে রাখা হত, ঠিক তেমনি স্বাধীন নারী-পুরুষদেরও বনো ডি. ভেস্‌তা এবং সিরেস উৎসবে অন্তর্ভুক্ত করা হত না। আরা ম্যাক্সিনাতে হারকিউলস্‌দের কাছ থেকে মহিলাদের সরিয়ে রাখা হত। সেই সময় প্রাচীন রোমান গণকেরা গণনা করতেন, ক্রীতদাসদের পরিবারে গ্রহণ করা হত। তারা পরিবারের দেবতাদের রক্ষনাবেক্ষণে নিজেদেরকে সুস্থিত করত।

অগাস্টাস আদেশ করেছিলেন যে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস মহিলারা ভেঠার মহিলা পুরোহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। আইনে বলা হয়েছিল যে, ক্রীতদাসদের কবরকে পবিত্র মনে করা হবে এবং তার আত্মার জন্য রোমান পুরাতত্ত্বে কোনও স্বর্গেরও স্থান নেই, কোন নরকেরও স্থান নেই। এমন কি জুবেনাল স্বীকার করেছিলেন যে ক্রীতদাসের আত্মা, দেহ তার মালিকের আত্মা, দেহ যা দিয়ে তৈরি, সেই দিয়েই গঠিত।

আইনে ক্রীতদাস

ব্যক্তি হিসাবে একজন ক্রীতদাসের কোন কলঙ্কচিহ্ন নেই। এমন কোনো সামাজিক এবং ধর্মীয় বাধা ছিল না, যা রোমের ক্রীতদাসকে তার সমাজ থেকে সরিয়ে রেখেছে। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে, স্বাধীন মানুষের সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই। পোশাক, রঙ—কোনো দিক থেকেই তার তফাৎ ধরা পড়বে না। স্বাধীন মানুষের সঙ্গে সমানভাবে সে এক-ই খেলা উপভোগ করতে পারে, পুর শহরে সমানভাবে জীবনাপন করতে পারে। সরকারি চাকরিতে বহাল হতে পারে, স্বাধীন নাগরিকের মতো ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত হতে পারে। বরং আইনে তাকে যে অধিকার দিয়েছে, তার থেকে বেশি অধিকার সে আমাদের কাছ থেকে পেয়েছে। ক্রীতদাস এবং স্বাধীন নাগরিকের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান সামান্যই ছিল। ক্রীতদাস এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি হত। ক্রীতদাসদের কোনরকম ঘৃণা করা হত না। তাদের অস্পৃশ্য গণ্য করা হত না, বরং সম্মান প্রদর্শন করা হত।

অস্পৃশ্যদের অবস্থা ক্রীতদাসদের চেয়ে খারাপ ছিল। বরং মধ্যযুগের ইহুদিদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের তুলনা করা যেতে পারে। গোলামের মত আজ্ঞাধীন ইহুদিদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের অবস্থার তুলনা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কিছু বলার আছে, প্রথমত ইহুদিদের সঙ্গে এই যে বিভেদ, তা কিসের ওপরে ভিত্তি করে হয়েছিল সেটা বুঝাবার ব্যাপার, যদিও যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না ধর্মের ব্যাপারে ইহুদিদের

একগুঁয়েমির ফলেই এরকম হয়েছিল। গোষ্ঠীর ধর্ম গ্রহণ করতে সে অস্বীকৃত হয়েছিল এবং তার একগুঁয়েমির ফলেই এইসব শাস্তি তাকে পেতে হয়েছিল। যখন একগুঁয়েমি ত্যাগ করেছে, তখন-ই তাকে এই সমস্ত বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু নয়। তার প্রতি যে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে সেটার কারণ এই নয় যে, সে প্রচেষ্টায় কিংবা গির্জার বিরোধিতা করেছে। ইহুদিদের অক্ষমতার দ্বিতীয় কারণ হল, ইহুদিরা পুরোপুরি অঙ্গীভূত হতে চেয়েছিল এবং গোষ্ঠীতন্ত্রে আচ্ছাদিত হয়েছিল। এতে অবাক লাগতে পারে কিন্তু এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই ব্যাপারে ইতিহাস থেকে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, এবং ইহুদিদের মনোভাবের কিছু নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথম ঘটনা, নেপোলিয়ানের রাজত্বর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফ্রান্সের জাতীয় সংসদ গঠিত হবার পরে ইহুদিদের মানবাধিকারের ঘোষণাকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীলরা ইহুদিদের সমস্যাকে আবার উত্থাপন করেছিল। নেপোলিয়ান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ইহুদিরা নিজেরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিক।

"তিনি ফ্রান্স, জর্মন এবং ইটালির বিশিষ্ট ইহুদিদের নিয়ে একটি সংসদ গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন। ইহুদি ধর্মকে নাগরিক প্রয়োজনের সঙ্গে মেশানোটা কি সঙ্গতিপূর্ণ হবে, সে ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত হতে চাইছিলেন। কারণ, তাঁর ইচ্ছে নাগরিকদের সঙ্গে ইহুদিরা একত্রিতভাবে বসবাস করুক। ১১ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত সংসদ ২৫শে জুলাই ১৮০৬ সালে প্যারিসের টাউন হলে মিলিত হয় এবং তাদেরকে কতগুলি বিষয়ে বারোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সেই প্রশ্নগুলি যে যে বিষয়ের ওপরে ভিত্তি করে করা হয়েছিল, সেগুলি হল মূলত ইহুদিদের দেশপ্রেমের সম্ভাব্যতা, ইহুদি এবং ইহুদি নয় এমন দম্পত্তির মধ্যে অসম বিবাহে অনুমতি দান এবং সুদের কারবারের বৈধতা প্রসঙ্গে। সংসদের উত্তরে নেপোলিয়ান এতই খুশি হয়েছিলেন যে, জেরুজালেমের সর্বোচ্চ ইহুদি ব্যবস্থা পরিষদ ও আদালতকে আহ্বান করেছিলেন, জেরুজালেমের প্রাচীন মডেলের পর্ষদকে রূপান্তরিত করে আইন-ব্যবস্থার সংস্থা যাতে জারি করতে পারেন। এই ইহুদি ব্যবস্থা পরিষদ ও আদালত ফ্রান্স, জর্মন, হল্যান্ড এবং ইটালির ৭১ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং এরা ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি ষ্ট্র্যাসবার্গের রব্বি সিন্‌জেমিন এর প্রেসিডেন্সিতে মিলিত হন এবং একটি সনদ গ্রহণ করে ইহুদিদের পরামর্শ দেয়, যাতে ইহুদিরা ফ্রান্সকে তাদের মাতৃভূমি হিসাবে মনে করে এবং এখানকার নাগরিকদের ভ্রাতৃজ্ঞান করে এবং এখানকার

ভাষায় কথা বলে এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে বিবাহে সম্মত হয়। কিন্তু উপাসনার জন্য মিলিত ইহুদিগণ তাঁকে অনুমোদন করেনি। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে ইহুদিরাই এই অসমবর্ণ বিবাহে সম্মত হয়নি। তারা শুধু তাদেরকে মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭৯৫ সালে, যখন বাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যে নিয়ম মেনে তারা কাজ করেন, তার কাছ বৈষম্য দূর করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে প্রগতিশীল ইহুদিরা প্রথমে সম্পূর্ণ নাগরিকত্ব পাবার জন্য যে দাবি জানিয়েছিলেন। আমস্টারতেম ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ তার বিরোধিতা করেন। তারা ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, নাগরিক সমাজাধিকার ইহুদি ধর্ম রক্ষার ব্যাপারে আরো শক্তিশালী বাধা সৃষ্টি করবে। তারা ঘোষণা করলেন যে, তাদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি অবস্থা রেখেই এই নাগরিকত্বের অধিকারকে মেনে নেওয়া হচেছ না।

এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ইহুদিরা গোষ্ঠীর সদস্য হবার চেয়ে বিদেশি হয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করেছিল। তারা (সর্বকালীন মানুষ) হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করলেন এবং নিজেদের শাস্তি দিলেন। কিন্তু অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তারাও অন্য অর্থে পৃথক মানব সত্ত্বা যারা সমাজের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা তাদের ইচ্ছায় হয়নি। তারা মিশতে চায় নি বলে যে শাস্তি পেয়েছিল, তা নয়। তাদের অপরাধ তারা মিশতে চেয়েছিল।

অস্পৃশ্যতা ক্রীতদাস প্রথার চেয়েও খারাপ। কেননা দাসত্বতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে মূল্য দেওয়া হয়, কিন্তু অস্পৃশ্যদের তা দেওয়া হয় না। কিন্তু দাসত্বর চেয়ে অস্পৃশ্যতা আরও খারাপ এই যুক্তির স্বপক্ষে এইটুই একমাত্র কারণ নয়। আরও কারণ আছে যেগুলি স্পষ্ট নয়, কিন্তু সেগুলির সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে যেটিই কম, তার সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে যেটি কম স্পষ্ট প্রথমে তারই উল্লেখ করা যাক্?

ক্রীতদাস প্রথা, যদি ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তাহলে মালিকরা দায়িত্ব ক্রীতদাসের জীবন ও শরীরকে রক্ষা করা। ক্রীতদাসের নিজের খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয় সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব থাকবে না। তার সমস্ত কিছু মালিক তাকে দেবে। এটা কোনো বোঝা নয়, কারণ ক্রীতদাস তার যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি আয় করে। কিন্তু একজন স্বাধীন মানুষের পক্ষে তার বাসস্থান এবং থাকার নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্ত মজুর সে কথা জানে। কাজ

করতে চাইলেই সব সময় কাজ পাওয়া যায় না কিন্তু একজন কর্মী এই নিয়মটা জানে যে, কাজ নেই মানে রুটিও নেই। কাজ নেই মানে রুটিও নেই, ব্যবসায় জোয়ার ভাঁটা, বাজার কখনও তেজি, কখনও মন্দা, প্রত্যেক স্বাধীন মজুরকে এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। কিন্তু এতে ক্রীতদাসের কোন ক্ষতি হয় না। তার রুটির কোন অভাব নেই। বাজার তেজি বা মন্দা যাই হোক না কেন, ক্রীতদাসের তাতে কিছু আসে যায় না। তার রুটির সমপরিমাণই থাকে। কিন্তু অস্পৃশ্যতা ক্রীতদাস প্রথার চেয়েও খারাপ, কেননা তাদের এ ধরনের কোন নিরাপত্তা নেই। অস্পৃশ্যদের খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্রের জন্য কেউ দায়িত্ব নেয় নি। এই অর্থে অস্পৃশ্যতা দাসত্বর চেয়ে শুধু খারাপ-ই নয়, দাসত্বর চেয়ে এটি নির্মম। দাসত্ব প্রথায় মালিকের দায়িত্ব ক্রীতদাসের কাজ জোগাড় করে দেবার। মুক্ত শ্রমিক ব্যবস্থায় কাজ পাবার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। কাজ পাবার এই হুড়োহুড়িতে একজন অস্পৃশ্য কি করে ভালো কাজ পাবে? সংক্ষেপে বলতে গেলে তার এই সামাজিক অবস্থার জন্যই সকলের শেষে তার চাকরি পাবার সুযোগ ঘটে এবং সকলের প্রথমেই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

অস্পৃশ্যতা দাসত্বের চেয়েও অনেক বেশি নির্মম। কেননা জীবিকা আইনের কোনও উপায় না থাকলেও তাদের জীবন নির্বাহের দায়িত্ব তাদের-ই গ্রহণ করতে হয়। অন্য একটি কারণে অস্পৃশ্যতা দাসত্বের চেয়েও খারাপ। ক্রীতদাসদের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হত। এর ফলে মুক্ত নাগরিকের চেয়ে তাদের সুবিধা বেশি ছিল। তাদের এই অবস্থার জন্যই মালিক তার নিজের স্বার্থেই তাদের স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বেঁচে থাকার ব্যাপারে দৃষ্টি দিতেন। রোমে ক্রীতদাসদের কখনই জলা কিংবা ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় নিযুক্ত করা হত না। এই সমস্ত এলাকায় শুধুমাত্র মুক্ত নাগরিকদের পাঠানো হতো।

ক্যাটো রোমান কৃষকদের উপদেশ দিয়েছিলেন, ক্রীতদাসদের যেন জলাপূর্ণ এলাকা কিংবা ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় পাঠানো না হয়। এটা অবাক হবার মত ঘটনা। একটু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এটাই স্বাভাবিক। ক্রীতদাসরা মূল্যবান সম্পত্তি এবং যে কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি ম্যালেরিয়া প্রবণ জায়গায় তাদের পাঠাতে অস্বীকারই করবে। কিন্তু কোনও মুক্ত নাগরিকের ক্ষেত্রে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন নেই, কেননা মালিকের সে মূল্যবান সম্পত্তি নয়। এই মানসিকতার জন্যই ক্রীতদাসেরাই উপকৃত হয়েছে। তাকে যতটা যত্ন নেওয়া হত, অন্যকে তা করা হত না। একটি অস্পৃশ্যর ক্ষেত্রে এই বিবেচনা করা

হয়নি। সে অবহেলিত হয়েছে। তাকে অভুক্ত থাকতে হয়েছে এবং মৃত্যু মুখে পতিত হতে হয়েছে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পার্থক্য হল, দাসত্ব কখনও বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু অস্পৃশ্যতা বাধ্যতামূলক। একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দাস হিসাবে ব্যবহার করতে পারত। সে যদি না চাইত, তার কোনো বাধ্যতামূলকতা ছিল না। অন্যদিকে একজন হিন্দু একজন অস্পৃশ্যকে অস্পৃশ্য হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য।

অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে তার যে ধারণাই থাকুক না কেন, একজন হিন্দুকে এই নিয়ম মেনে নিতেই হবে।

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : পঞ্চবিংশতি খণ্ড

অনুবাদে

- **মহুয়া ভট্টাচার্য** : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও যুক্ত। দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর সংবাদমূলক বহু অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেছেন।
- **ড. সন্দীপ দাঁ** : অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। কলকাতার একটি বিখ্যাত কলেজের সান্ধ্য বিভাগের উপাধ্যক্ষ।

অনুমোদনে

- **আশিস সান্যাল** : কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, শিশু-সাহিত্যিক ও অনুবাদক। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। জাতীয় কবির সম্মানে সম্মানিত।

নির্ঘণ্ট